মরীচিকা

সমরেশ বসু

সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ গোয়ালাটুলি লেন
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র : ১৩৫৮

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলী লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক :
সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
...দ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
... পটুয়াটোলা লেন
...-৯

মরীচিকার কাহিনীসূত্র আপনার দান।

আপনাকেই এই উপন্যাস উৎসর্গ করলাম

মরীচিকা — সমরেশ বসু

আজ রমা সেনের জন্মদিন।

একটি মাত্র বাক্যে, কথাটা এত সহজে উচ্চারণের থেকে, সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক অনেক বেশি বিস্তৃত গভীর, উজ্জ্বল আর আলোকিত। অত্যুক্তি হবে না, যদি বলা যায়, এটি কলকাতা নগরের বুকেই একটি বিশিষ্ট দিন। আরব সাগরের কূলে, মুক্তা হার-তীরের-বুকেও এই দিনটি অনেক প্রাণ মনকে আলোকিত করার দিন। য়োরোপের কোনো শিল্পকুশলী রাজধানীর তুহিন শীতল বুকেও এই দিনটি কি উষ্ণতার সঞ্চার করে নি ?

করেছে, কোনো সন্দেহ নেই। রমা না, রুমি সেইন্, একটি প্রিয় নাম, পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তব্যাপী। রমা কখন রুমি হয়ে ওঠে ? যখন রমা হয়ে ওঠে আদরের ভালবাসার ধন। সকলের। এ নাম কোনো ব্যক্তির দান না। অনেক শুভাকাংখার অনেক প্রেমিকের দাবী আছে এই নামে। হ্যাঁ, প্রেমিকের। স্বয়ং রমা সেনও জানে না, জগৎ জুড়ে ওর প্রেমিকের সংখ্যা কতো। কিন্তু সেই প্রেমের মধ্যে রয়েছে এক অপরিসীম বিস্ময়। বিস্ময়ের পাশে পাশে শ্রদ্ধাবোধ। কারণ রমা সেন কেবল একমাত্র কবির "বনলতা সেন" না। একটি নাম মাত্র না। এমন কি, ও নয় জনবন্দিত কেবল সেই আদিম জিজ্ঞাসার নায়িকা, "কোনো কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী, / হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!" যদিও এক দিক থেকে অসংখ্য গুণমুগ্ধদের কাছে, নিশ্চয়ই ওর একটা পরিচয়, "যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী / হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!"

আসলে ওকে বলা যায়, একটা যুগ। রুমি সেন নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন।

যদি প্রশ্ন ওঠে, আজকের দিনটি রুমি সেনের কতো তম জন্মদিন, তা হলে কবির সেই অপার জিজ্ঞাসাই আবার উচ্চারিত হবে, "কোনো কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী ?" ওর প্রতিটি জন্মদিনই, নব জনমের দিন। কারণ ও একজন শিল্পী। রুপোলী পর্দার এমন একজন শিল্পী রুমি সেন, যাকে বলা যায়, বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি যার বিকাশ ঘটেছে। ঘটে চলেছে প্রতিদিন। আসলে ও শিল্পী হিসাবেই অনন্তযৌবনা। কেবল রূপে না। আর সেই অর্থেই রুমি সেন, জনমানসের রুপোলী আকাশে ভুবনমনমোহিনী, বিলোলহিল্লোল উর্বশী।

রুমি সেন পত্রিকাওয়ালাদের কৃপায়, তাদের মলাটের ছবিতে "তারকা" নামের খ্যাতি অর্জন করে নি। সেক্ষেত্রে ওর গভীর সাধনাই, আপনাতে আপনি বিকশি উঠেছে। কিন্তু ওর আজকের জন্মদিনটা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ আর সুদূরপ্রসারী। সেই তাৎপর্য আর সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের কথা ও নিজে জানতো না, অন্য কারো পক্ষেও অনুমান করা অসম্ভব ছিল।

তাৎপর্যপূর্ণ আর সুদূরপ্রসারী বলেই বোধ হয়, ওর আজকের জন্মদিনের সন্ধ্যাটা শুরু হলো, কলকাতাকে চমকিয়ে দেওয়া এক আশ্চর্য অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে। অবিশ্যি ওর অপরাহ্নের জন্মলগ্নে, মাতৃসমা সুধাময়ী নিজের হাতে রমার মুখে তুলে দিয়েছেন পরমান্ন। রুপোলী পর্দায় এক কালে যিনি ছিলেন, রুমি সেনের মতোই ভুবনমনমোহিনী সুধা দেবী, বয়সের অস্তাচলে দাঁড়িয়ে যিনি আজ একাধারে সুগৃহিণী, জননী, এবং ক্যারেকটার রোলে অদ্বিতীয়া, তিনি নিজের হাতে তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন অমৃত পায়েস। অপরাহ্নে, রমার সঠিক জন্মক্ষণে, সেই ঘরোয়া নিভৃত অনুষ্ঠানটি হয়েছিল, রমার রমা গৃহে। রমার একান্ত একাকিনী বাসগৃহে একমাত্র ওর দাস

দাসীরাই ছিল তার সাক্ষী। জননী যেমন জন্মদিনে সন্তানের মুখে তুলে দেন পরমান্ন, সেই নিভৃত অনুষ্ঠানটি ঘটেছিল সেই রকম। সেই পরিবেশ ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ, করুণ ও মধুর। বিদেশী নিয়মে, বয়সের সংখ্যায় সেখানে মোমবাতি জ্বলে নি। একটি তেলের প্রদীপ জ্বলেছিল। স্বস্তিক চিহ্ন ঘটপূর্ণ পাত্রে ছিল ধান দুর্বা, মনসা পাতায় কাজল, আর সিঁদুর। আর পরমান্নের পাত্র।

সুধাময়ী অবিশ্যি বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্পীদের দ্বারা তৈরি একটি বিশেষ ভাবে ও রঙে বোনা গরদের শাড়ি জড়িয়ে দিয়েছিলেন রমার গায়ে, যে-শাড়ির সুবর্ণ জমির দু'দিকে দু'রঙের বিরাট চওড়া পাড়। লাল আর কালো। যেন জীবনেরই প্রতীক দুটি তট, অথচ সুবর্ণ তার বুকের রেখা। নিজের হাতে সূক্ষ্ম করে কাজল পরিয়ে দিয়েছিলেন রমার দুই প্রতিমা চোখে। মাথায় দিয়েছিলেন ধান দুর্বা। তর্জনীতে সিঁদুর নিয়ে, কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন একটি টিপ, তারপরে যেন করুণ আর্ত চোখে তাকিয়েছিলেন রমার শুভ্র সিঁথির দিকে।

সেই মুহূর্তটিতে, রমার জন্মলগ্নের মুহূর্তটিতে, মহাকালও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? উর্বশী রুমি সেনের বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া কি মুহূর্তের জন্য থমকিয়ে গিয়েছিল? বন্ধ হয়ে এসেছিল নিশ্বাস? সুধাময়ীর দুই চোখের কোণে দুটি বিন্দু টলটল করে উঠেছিল। তিনি মঙ্গলঘটের গায়ে তর্জনীর সিঁদুর রেখা এঁকে দিয়ে, অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, "ওগো প্রজাপতি, সেই দিনই তাড়াতাড়ি এনে দাও, যে-দিনে এই রেখা আমি ঠিক জায়গায় এঁকে দিতে পারবো।"

রমা ওর বুকের এক দুরন্ত আবেগের আবর্তকে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে সামলিয়েছিল। আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেছিল সুধাময়ীকে। মনে মনে বলেছিল, "আমার মানবী জীবন সার্থক হোক।"

সুধাময়ী শঙ্খ তুলে তিনবার ধ্বনি করেছিলেন। তারপর মিষ্টান্ন তুলে দিয়েছিলেন রমার মুখে। রমার মুখে তখন হাসি ফুটেছিল,

কিন্তু ওর কাজল কালো চোখের কোণে দুটি বিন্দু ঝিকমিক করে উঠেছিল। তবু সেই নিভৃত অনুষ্ঠানটিই ছিল, রমার প্রকৃত জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

এখন এই সন্ধ্যারাত্রে, খোলা আকাশের নিচে চলেছে এক অভিনব উৎসব। এই অভিনব উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা দুজন। শ্রী বি. আর. মাথুর এবং শ্রী আর. এন. গাঙ্গুলি। প্রথমোক্ত শ্রীমাথুর কলকাতা বম্বের একজন দিকপাল পরিবেশক। শ্রীগাঙ্গুলি একজন দিকপাল প্রযোজক। সন্ধ্যারাত্রের এই উৎসব অনুষ্ঠানটি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় নি। কিন্তু লালবাজার পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি মাথুর আর গাঙ্গুলি সংগ্রহ করেছেন। কলকাতার দক্ষিণে রমণীয় জলাশয়ের তটপ্রান্তে, পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সেই সাহায্য পাওয়াও গিয়েছে, কারণ জনচিত্তবন্দিতা রুমি সেন সেখানে উপস্থিত। ঘটনাটা আগে প্রচার করা না হলেও কলকাতা এমন একটি শহর, যেখানে বার্তা রটে যায় বাতাসের আগে। ভক্তদের আবেগ আর উচ্ছ্বাস এক এক সময় এমন আকার ধারণ করে, যেন মন্দিরের বিগ্রহকে স্পর্শ আর ভক্তির তাণ্ডবে বিচূর্ণিত হতে হয়।

সাবধানতা সেই কারণেই বিশেষ করে। তাছাড়া, স্থান ও কালের জন্য পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আতসবাজীর অভিনবত্বের জন্য। প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বি. আর. মাথুরই করেছিলেন। রুমি সেন বর্তমানে যে ছবিটিতে কাজ করছে, তার প্রযোজক শ্রীআর. এন. গাঙ্গুলি, সারা ভারতের পরিবেশক শ্রীমাথুর।

নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণ আকাশে, যে আতসবাজীটি প্রথম আলোর মালা ছড়িয়ে উঠলো, তার বুকে ফুটে বেরলো নানা রঙের আলোয়, বাঙলা অক্ষরে লেখা, "রুমি সেনের শুভ জন্মদিনে" লেখাটি নানা রঙের ফুলে বেশ খানিকক্ষণ আকাশে দ্যুতি ছড়িয়ে দিল। দিগন্ত কাঁপিয়ে জনতার উল্লসিত ধ্বনি শোনা গেল।

রমা সেন আকাশের বুকে ওর জন্মদিনের লেখা পড়ছে আতসবাজীর বর্ণমালায়। ওর চারপাশে ঘিরে রয়েছে বড় ছোট নানা দিকপাল পরিবেশক, প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলী আর নায়ক নায়িকারা। অবিশ্যিই সেই সঙ্গে কলকাতার নানা স্তরের ভি. আই. পি-রা, এলিট্‌স্‌ অফ দ্য সোসাইটি।

এখন ওর পোশাক আলাদা। শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে, নিভাঁজ জড়ানো একটি কচি ঘাস রঙের ম্যাক্‌সি. উঁচু হিল জুতো পরা, পায়ের পাতার গোড়ালি জড়িয়ে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। কটি থেকে নাভিস্থল পর্যন্ত আঁট বন্ধনী অনেকটা চওড়া বেল্টের মতো। যদিও বেল্ট নয়, ম্যাক্‌সির কারিগরি ওর মেদহীন কটিদেশ ও নাভিস্থলকে নিখুত আর নিভাঁজ বেষ্টন করেছে, আর ওর অনতিগুরু নিতম্বকে প্রতিটি রেখায় জীবন্ত করে, উরুস্তম্ভের নীচে নেমেছে, এবং অনতিগুরু নিতম্বের সঙ্গে আশ্চর্য পরিমাপের বক্ষযুগলকেও ঢাকা দিয়েছে যেন এক বিপদ সীমার রেখা ছুঁয়ে। বিপদ সীমাই বলতে হবে, কারণ ওর স্তনান্তরের গভীর রেখাটি ঈষৎ অনাবৃত। একটি মাত্র মুক্তার হার ওর গলা থেকে নেমে এসেছে দুই বক্ষচুড়ায়। তুলনা দিলে বলতে হয়, "তব স্তনহার হতে নভস্থলে খসি পড়ে তারা / অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, / নাচে রক্তধারা।"

তুলনাটা নিতান্ত মিথ্যা না। নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণ আকাশের বুক আলোকিত করা আতসবাজীতে "রুমি সেনের শুভ জন্মদিনে" দ্যুতি ছড়াচ্ছে, পুলিশ কর্ডনের বাইরে অগণিত ভক্তদের উল্লসিত চিৎকার যখন ভেসে আসছে, তখন রুমি সেনের আশেপাশে অনেক পুরুষেরই বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা। আকাশে আতসবাজীর লেখার থেকেও, কাছের রুমি সেন যেন অধরা প্রতিমা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীমাথুর ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগছে আপনার মিস সেন?"

রুমি কি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? ওর চোখের সামনে কি অপরাহ্ণের সেই জন্মদিনের নিভৃত অনুষ্ঠানটির ছবি ভেসে উঠছিল? ও একটা উদ্গত নিশ্বাস চেপে তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে হেসে জবাব দিল, "সুন্দর!"

"হতেই হবে, হতেই হবে।" অন্য পাশ থেকে শ্রীগাঙ্গুলি বলে উঠলেন, এবং কেবল বাঙালী বলে না, শিল্পী জীবনের গোড়া থেকেই তিনি ওকে দেখে এসেছেন, বয়সেও অনেক বড়, আর সেই সুবাদেই, তিনি ওকে 'তুমি' করে বলেন, "জানো তো রুমি, এ সবই হলো মিঃ মাথুরের কীর্তি আর আয়োজন। উনি ছাড়া, এ সব আর কার মাথায় আসবে?"

রুমি জানে মিঃ মাথুর এই প্রশংসার স্বীকৃতিটুকুর জন্য ওর মুখের দিকেই সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন। অতএব রুমিকে মিঃ মাথুরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতেই হলো। আসলে শ্রীগাঙ্গুলি কথাটা বললেন, নিতান্তই মাথুর সাহেবকে তেল দেবার জন্য। রুমির হাসিটুকু শ্রীগাঙ্গুলিকে কিঞ্চিৎ কৃপা করা।

ইতিমধ্যে আকাশের বুকে পর পর কয়েকটি হাউই ছুটে গিয়ে ফট্ ফট্ শব্দে রঙের ঝালর ছড়িয়ে দিল। আর সেই রঙের ঝালরের মধ্যে থেকেই এবার হিন্দিতে লেখা ফুটে উঠলো, "রুমি সেন কি শুভ জনম্ দিবস।"

আকাশ বাতাস মুখরিত করে আবার জনতার উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল। রুমি সেন এখন যে ছবিটিতে অভিনয় করছে, তার পরিচালক পাশ থেকে বলে উঠলেন, "সত্যি অভিনব! আমার ছেলেবেলায়, পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলি উপলক্ষে, ময়দানে বাজি পোড়াবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আতসবাজীতে সেই প্রথম লেখা পড়েছিলাম, "লং লিভ দ্য জর্জ ফিফ্‌থ।"

রুমি প্রায় একটি বালিকার মতোই বলে উঠলো, "কই, আমি তো দেখি নি?"

ওর কথা শুনে আশেপাশে সবাই হেসে উঠলেন। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিরা। মাথুর বললেন, "মিস্ সেন, আপনি তখনো এ পৃথিবীর মাটি দেখেন নি।"

রুমির বর্তমান ছবির যে জনপ্রিয় নায়ক, উজ্জ্বলকুমার কিছুটা কাব্য করে বললো, "তুমি তখনো তোমার মায়ের ইচ্ছে হয়ে ছিলে মনের মাঝারে।"

মিঃ গাঙ্গুলি উজ্জ্বলকুমারের প্রশংসা করতে গিয়ে, রুমিকেই দেখলেন বেশি। রুমি হাসলো উজ্জ্বলকুমারের দিকে তাকিয়ে, বললো, "আর তুমি বুঝি তখন মায়ের ইচ্ছেটা পূরণ করে, এই পৃথিবীর মুখ দেখেছো?"

উজ্জ্বলকুমার বললো, "নিশ্চয়ই! তবে তখনো মিঃ সান্যালের মতো ময়দানে যাবার বয়সটা হয় নি।"

কথাবার্তা হাসির মধ্যেই, আকাশের বুকে নিরন্তর হাউই রঙের আলো ছড়াচ্ছিল। পরিবেশের একটা প্রভাব আছে। রুমি ওকে কেন্দ্র করে আতসবাজীর উৎসব উপভোগ করছিল। ও নিজেকে যতটা রাজেন্দ্রাণী ভাবতে পারছিল না, ওর আশেপাশের চোখে ও তার চেয়ে অনেক বেশী রাজেন্দ্রাণীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ও মনে মনে খুশি এবং আনন্দ অনুভব করছিল, কিন্তু গর্বিত হয় নি। অথচ সংসারের নিয়মটাই এই রকম, অনেকের চোখেই ও যেন হয়ে উঠেছিল অতি গরবিনী। একটু দূরে দূরে, কোনো কোনো অতিথি গুচ্ছের মধ্যে, বিশেষ করে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখের ইশারায় ব্যঙ্গ ফুটিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করছিল, যার ভাষা অনেকটা "এ সব হলো মন যোগানো, ঢাক পেটানো। সবই মতলবের ব্যাপার!"

রুমি অবিশ্যি সে সব কথা শুনছিল না। বরং মিঃ গাঙ্গুলির পাশে দাঁড়ানো যুবকটিকে ও দু-একবার তাকিয়ে দেখেছে। যতোবারই যুবকটির দিকে চোখ পড়েছে, ততোবারই চোখাচোখি হয়েছে। তার

মানে, যুবকটি সব সময়ে রুমির দিকেই তাকিয়ে ছিল, আতসবাজীর দিকে তার যেন লক্ষ্যই ছিল না। তা না থাকুক, এবং রুমির দিকে অপলক তাকিয়েই থাকুক, তাতে ওর কিছু আসে যায় না। ও মনে মনে অবাক হচ্ছিল, কারণ লোকটি বা যুবকটিকে যেন এই পরিবেশে আদৌ মানাচ্ছিল না। আশেপাশের স্বল্পালোকেও যুবকটির অতি সাধারণ শ্রীহীন পোশাক চোখে পড়ার মতো। চারপাশের আধুনিক উজ্জ্বল আর দামী পোশাকের বর্ণাঢ্য মেলার মধ্যে, যুবকটি যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেমানান।

এটা বিশ্বাস করাই অসম্ভব, মিঃ মাথুর বা মিঃ গাঙ্গুলির মতো ব্যক্তি, এই লেকের ধারে বাজী পোড়ানো অনুষ্ঠানে এই রকম 'স্যাবি' পোশাকের একটি সাধারণ যুবককে নিমন্ত্রণ করেছেন। বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে ঘিরে রাখা বেষ্টনী ভেদ করে, কোনো রকমে লুকিয়ে ঢুকে পড়ে নি তো?

কিন্তু রুমি সেনের মতো মেয়ের, এই সামান্য ব্যাপারটাকে নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে? সে রকম অবাঞ্ছিত যদি কেউ ঢুকেই পড়ে থাকে, যথাসময়ে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। রুমি সেনের পক্ষে এ নিয়ে অবাক হওয়াটাই বরং বেমানান।

রুমির এই ভাবনার ফাঁকেই আবার চারিদিকে উল্লাসের ধ্বনি উঠলো। ও তাকিয়ে দেখলো, আকাশে বর্ণাঢ্য আলোর ঝালরে ইংরেজিতে ভাসছে, "হ্যাপি বার্থডে টু রুমি সেন।"

রুমি এতটা আশা করে নি, তিনটি ভাষার, আতসবাজীতে কলকাতার আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, ওর জন্মদিনের ঘোষণায়। মাথুর একটা নতুন আয়োজন করেছেন, আর তা হলো ফায়ারওয়ার্কস, ও তাই জানতো। আর বাকিটা ছিল ওর জন্য সারপ্রাইজ। রুমির আশেপাশে অনেকেই ওর খুব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো, বিশেষ করে নতুন হিরোইনের দল আর মহিলা শিল্পীরা। অবিশ্যি সুধাময়ী বাইরের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না।

আতসবাজীর শেষ লেখাটা আকাশে ফুটে উঠলো, "মাথুর ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজেস।"

বলা বাহুল্য, অতিথি বেষ্টনীর বাইরে এবার আর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল না, কিন্তু কিছু প্রক্ষিপ্ত হাততালি আশপাশ থেকেই শোনা গেল। হাততালিদাতারা অধিকাংশই পরিবেশক, প্রযোজক, তাঁদের অতিথিবৃন্দ আর কিছু শিল্পী পরিচালকও।

মিঃ মাথুর যথেষ্ট বাস্তববাদী এবং উপস্থিত বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি রুমির কাছে দ্রুত এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বললেন, "মিস সেন, এখনো কিছু বাজী পুড়বে, লোকের দৃষ্টি সেদিকেই আটকে থাকবে। এই ফাঁকে চলুন, আপনাকে নিয়ে আমি আমাদের আসল অনুষ্ঠানের জায়গায় চলে যাই। তা না হলে ভিড় সামলে আপনাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

মিঃ গাঙ্গুলি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। চলো রুমি, আমরা এগোই।"

মিঃ মাথুর তাঁর একটি হাত রুমির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। রুমি যথারীতি ম্যানার্স অনুযায়ী ওর বাঁ হাতটি রাখলো মিঃ মাথুরের হাতের ওপর। এগিয়ে চললো দ্রুত পুলিশ বেষ্টনীর দিকে। ওর আর এক পাশে উজ্জ্বলকুমার। রুমিদের চলতে দেখেই, আশেপাশের অন্যান্য অতিথিবর্গের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কয়েকজনের স্বরে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, "শী ইজ গোয়িং।"..."রুমি সেন চলে যাচ্ছে।"...ইত্যাদি।

রুমি সেনের জন্মদিনের আসল পার্টি—অর্থাৎ নাচ গান পান ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে, লেকের কাছাকাছিই এক বাড়িতে। যে-বাড়িটিকে তুলনা করা যায় একটি পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেলের

সঙ্গে। রুমির নিজের ইচ্ছেও ছিল সেই রকম, নিজের বাড়িতে কোনো আয়োজন না করে, কোনো বড় হোটেলের বড় হলে বার্থ-ডে পার্টি দেবে। ও সাধারণত তাই দিয়ে থাকে।

কিন্তু এবার ওর জন্মদিনটা সব দিক থেকেই ভিন্ন, আর তাৎপর্যপূর্ণ, যার সুদূরপ্রসারী পরিণতির বীজটি ওর এই যাবৎকালের জীবন মৃত্তিকায় আজ সন্ধ্যালগ্নেই প্রোথিত হলো। দিকপাল পরিবেশক শ্রীমাথুর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু, নামী এবং ধনী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, শ্রীকে. কে. দেওড়ার কলকাতায় তাঁর অন্যতম বিশাল বিলাস ভবনটি আজকের অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিয়েছেন। আসলে, রুমি সেনের এবারের জন্মদিনের সমস্ত দায়িত্বটাই, প্রায় একলা মাথুরজী পালন করছেন। প্রযোজক মিঃ গাঙ্গুলির অবদানও নিশ্চয়ই আছে, তবে সামগ্রিক ভাবে প্রধানত মিঃ মাথুরই এবারের বার্থ-ডে পার্টির হোতা।

অবিশ্যি গত কয়েক বছর ধরে, রুমির জন্মদিনের ব্যাপারটা আর ওর নিজের হাতে থাকে না। দিকপাল পরিবেশক প্রযোজকরাই স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে দায়িত্বটি গ্রহণ করে, নিজেরা ধন্য হন, জয় করে নেন রুমির খুশি কৃতার্থ হাসিটি। স্বাভাবিক, কারণ রুমি সেন এ যুগটায় কেবল যে রুপোলী পর্দায় স্বর্ণমৃগী, তা না। ব্যবসায়িক দিকটা তো আছেই। রুমি সেন অনেক পরিবেশক প্রযোজকের চাঁদির ভাণ্ডার ভরে দিয়েছে, নিজের প্রতিভা দিয়ে অনেক অনামী পরিচালককে রাতারাতি তুলে দিয়েছে খ্যাতির তুঙ্গে। শুধু মাত্র পুরুষের বক্ষোমাঝে রক্তধারা নাচানো রূপেই এটা সম্ভব না, এর পশ্চাতে রয়েছে শিল্পীর অনুশীলন, সাধনা, প্রতিভা। সেইজন্যেই আরো বিশেষ করে, সেই কবিতার পংক্তিটিকে একটু বদলে এ-ভাবে বলতে হয়, "রুমি সেনের মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।"···অতএব, ওর জন্মদিনের দায়িত্বটা সকলেই স্বেচ্ছায় ও সুখে বহন করতে চাইবে, এ আর এমন অধিক কী কথা!

অবিশ্যি দায়িত্ব যিনিই নিন, তাঁকে রুমির ইচ্ছা আর মতামতটা জেনে নিতেই হয়। মিঃ মাথুরকেও তা নিতে হয়েছিল, এবং স্বয়ং শ্রী কে. কে. দেওড়া নিজে মাথুরজীর সঙ্গে গিয়ে রুমিকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সরোবর সন্নিকটের ভবনে জন্মদিনের উৎসব পালন করবেন।

রুমি সম্মতি জানিয়েছিল, আর এখন শ্রী কে. কে. দেওড়ার রমণীয় বাগান সংলগ্ন বিলাস ভবনটি দেখে মনে মনে খুশি না হয়ে পারলো না। চারপাশে বাগানের মাঝখানে সবুজ লন। তার মাঝখানে জলের ফোয়ারা, যার বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সাত রঙের আলো। ডিম্বাকৃতি লনের চারপাশে ছয়টি মার্বেল পাথরের অপূর্ব ভাস্কর্য, রমণী আর পুরুষ মূর্তি কয়টিতে যেন বিশ্বের লাবণ্য আর বীর্যের শোভা ফুটে উঠেছে।

রুমি দেখলো লনে ইতিমধ্যেই কয়েকজন রমণী পুরুষ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। স্বয়ং কে. কে. দেওড়া ছুটে এলেন মিঃ মাথুরের গাড়ির কাছে। নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে, রুমিকে নামতে সাহায্য করলেন। দেখতে দেখতে অতিথি অভ্যাগতের ভিড় বেড়ে উঠলো। সরোবরের ধারে আতসবাজীর উৎসবে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও চলে এসেছেন। রুমি কে. কে. দেওড়ার সঙ্গে নীচের বিশাল হল ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হল ঘরটিকে একটি ফাইভ স্টার হোটেলের লাউঞ্জের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নানা বর্ণের বেলুন, ফুলের মালায় ও তোড়ায় হল ঘরটি সাজানো হয়েছে। রুমির জন্য রীতিমতো একটি রমণীয় সিংহাসনের ব্যবস্থা। যেখানে গিয়ে বসতে রুমি সত্যি লজ্জাবোধ করলো।

আয়োজন নিখুঁত, কিন্তু বড় বেশী আড়ম্বর। মুহূর্তের মধ্যেই রুমির দু' হাত আর গলা ভরে উঠে, ছাপিয়ে উঠলো ফুলের তোড়ায়, স্তবকে, মালায়। মিসেস কে. কে. দেওড়া নিজের পরিচয় দিয়ে, একটি ফুলের মুকুট পরিয়ে দিলেন রুমির মাথায়। হাততালি, উল্লাসের

ধ্বনি, বেলুন ওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই উর্দি পরা বেয়ারারা নানা রকমের পানীয় ভরা গেলাসের ট্রে নিয়ে অতিথিদের মধ্যে বিতরণ শুরু করলো। ধ্বনি উঠলো, "হ্যাপি বার্থ-ডে টু রুমি সেন।" গেলাসে গেলাসে ঠুং ঠুং আওয়াজ উঠলো। তারপরেই বেজে উঠলো বাজনা। রুমিকে ঘিরে অনেকে নাচতে আরম্ভ করলো।

রুমি সেন দেবী না, মানবী। ও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হাসি ছাড়া, আর কিছুই করতে পারলো না। যদিও ও অনুভব করছে, ওর অন্তরের গভীরে একটা বিষণ্ণতার সুর যেন বেজেই চলেছে, তথাপি এই উৎসব অনুষ্ঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ও বিস্মিত খুশিতে নির্বাক। এত হাসি নাচ গান, আলো আর ফুলের উৎসব, সব আয়োজনই ওকে ঘিরে। সকলের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন মাথা পেতে নিতে নিতেও, ওন মনটা খুশিতে ভরে উঠছে।

কিন্তু রুমি বেশিক্ষণ নির্বাক হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো পারলো না। স্বয়ং মাথুরজী এগিয়ে এসে, রুমির দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন হাসিতে ইংরেজিতে বললেন, "আসুন মিস্ সেন, এই বৃদ্ধকে একটু প্রাণদান করুন!"

রুমি হেসে, মাথুরজীর হাত ধরে নাচের আসরে নামলো। খুবই শালীন আর মন্থরগতি নাচের মধ্যে, রুমির হঠাৎ চোখ পড়লো মিঃ গাঙ্গুলির দিকে, এবং তাঁর পাশেই সেই শ্রীহীন, এই পরিবেশে বেমানান পোশাক পরা সেই যুবকটির দিকে। মিঃ গাঙ্গুলি হীরার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবী আর চুনোট ধুতিতে খাঁটি সম্পন্ন বাঙালী, পানীয়র গেলাস হাতে কথা বলছিলেন এক পরিবেশক-প্রযোজকের সঙ্গে। আর আশ্চর্য, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটি অপলক চোখে রুমিকেই দেখছে!

কেন, রুমির অচেতন মনটা কি সহসা একটু চমকিয়ে উঠলো? কে যুবকটি? কার পরিচয়ে, কার নিমন্ত্রণে রুমির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছে? নাচের ছন্দে দূরে সরে গিয়ে, পাক খেয়ে ফিরতেই আবার

যুবকটির সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। আবার অচেতন মনে লাগলো একটা চমকের ঝিলিক। এবারে ওর লক্ষ্য পড়লো, যুবকটির পোশাকে ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও, তার চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতা আছে। দীর্ঘদেহী, মেদবর্জিত স্বাস্থ্যবান চেহারা। এ বেলাটা বোধহয় চুলে চিরুনিই পড়ে নি, তাই ঢেউ খেলানো চুল উসকো খুসকো। তার পোশাকের সঙ্গে সেটাই যেন মানানসই। কিন্তু সে কি আজ গালে রেজারও টানে নি? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। অথচ এসেছে একটি উজ্জ্বল অভিজাত উৎসবের অঙ্গনে?

নাচের ছন্দে রুমি আবার মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে গেল। কিন্তু ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো যুবকটির অপলক দুটি চোখ। হ্যাঁ, চোখ দুটির দৃষ্টি গভীর, অনুসন্ধিৎসু, উজ্জ্বল। তথাপি কি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক বিষণ্ন? না, অন্যমনস্ক না, বরং রুমির প্রতি সেই চোখ দুটিতে রয়েছে যেন বিশেষ ব্যগ্রতা। কেন? যুবকটি রুমির দিকেই এমন ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসু অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কেন? কী দেখছে?

আশ্চর্য! রুমি সেন কি ভুলে গেল, ও হচ্ছে রুমি সেন! ওর দিকে একজন অজ্ঞাত যুবক ব্যগ্র অপলক চোখে চেয়ে দেখবে, এটাই তো স্বাভাবিক। রুমি সেন কি জীবনে এই প্রথম, কোনো অজ্ঞাত যুবকের এ রকম অপলক ব্যগ্র চোখ দেখছে? এমন তো ও হাজার হাজার দেখেছে। মনে তো কখনো জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয় নি। বড় জোর একটু ভালো লেগেছে, ওর শিল্পীস্বত্তা সুখী ও কৃতজ্ঞ হয়েছে। জিজ্ঞাসার উদ্রেক কখনোই হয় নি।

ইতিমধ্যে নাচের আসরের তাল ফিরে গেল। রুমি বিশ্রাম পেল না। উজ্জ্বলকুমার হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। শত হলেও উজ্জ্বলকুমার, জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা—ম্যাটিনী আইডল। রুপোলী পর্দায় দুজনে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় এক আধ ইঞ্চি আগে পরে। তবে সারা ভারত আর ভারতের বাইরে, রুমি সেনের জনপ্রিয়তা

বেশি, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নাচতে গিয়েও, রুমির মস্তিষ্কের কোথাও কি উজ্জ্বলকুমার ছিল?

না, সত্যের খাতিরে কথাটা বলতেই হয়, যদিও রুমি নিজেও জানে না, মিঃ গাঙ্গুলির পাশে দাঁড়ানো যুবকটির দিকেই বারে বারে দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে। রুমি লক্ষ্য করেছে, যুবকের হাতের গেলাসে নিতান্তই সফ্‌ট্‌ ড্রিংক, এবং তাতে একবারও বোধ হয় চুমুক পড়ে নি। এটা চোখে পড়লো আরো বিশেষ করে, রুমি অন্তত অনুমান করে নিতে পারতো, কড়া অ্যালকোহলের গুণে, যুবকটি ইনটক্সিকেটেড হয়ে, ওর দিকে স্থানকালপাত্র ভুলে এ রকম অপলক তাকিয়ে আছে। সুরা যার নাম, যার মদির মৃদু গন্ধ এখনও ওর নাচের পার্টনারের নিশ্বাস থেকে পাচ্ছে। কিন্তু এ্যাপেল জুস্‌ বা ওই জাতীয় পানীয়ের পাত্রটি তো যুবকের হাতে অনড় হয়ে রয়েছে। যেন ভুলে গিয়েছে চুমুক দিতে।

অবিশ্যি সরোবরের ধারে, আতসবাজীর উৎসবেও যুবক এ-ভাবেই রুমির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানেই প্রথম তাকে চোখে পড়েছিল। যাকে বলে, চোখাচোখি হয়েছিল। কিন্তু কী আসে যায় তাতে? রুমি সেনের জীবনে এ রকম চোখাচোখি অনেক হয়েছে। সুরাসক্ত নিশ্চল অপলক চোখের লুব্ধ কটাক্ষও কিছু কম দেখে নি। এখনো কি দেখছে না? কলকাতার নামী দামী ধনীদের চোখই শুধু না, এলিট্‌স্‌দের অনেকের চোখেই তো আসল নেশা রুমি। রুমি সেন!

তথাপি মিঃ গাঙ্গুলির পাশের যুবকটিই ওর মস্তিষ্কে খচ্‌খচ্‌ করছে কেন? কে ও? কার নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসেছে? ও কি কোনো পরিচালক বা ক্যামেরাম্যানের নতুন সহকারী? সেটা হওয়া কিছু আশ্চর্যের না। আর সেই সূত্রেই হয়তো এই আসরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু সে-রকম কেউ কি রুমি সেনের দিকে এ রকম অপলক ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে থাকতে পারে? পারে কি এমন দিকপাল প্রযোজক মিঃ গাঙ্গুলির পাশে দাঁড়িয়ে

থাকতে? তা যদিও না থাকতে পারে, রুমি সেনের মস্তিষ্কে বিঁধে থাকতে পারে কি?

উজ্জ্বলকুমারের নাচের টানে ভাসতে ভাসতেই, রুমি চকিত হয়ে লক্ষ্য করলো মিঃ গাঙ্গুলি যেন যুবকটিকে কি বলছেন। যুবকটি যেন অপ্রস্তুত হাসলো, তাড়াতাড়ি গেলাস তুলে চুমুক দিল। মিঃ গাঙ্গুলি যেন আরো কিছু বললেন, এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে, একজন স্ন্যাকস্ বেয়ারাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। রুমি বুঝতে পারলো, মিঃ গাঙ্গুলি যুবককে কিছু খেতে বলছেন। যুবক যেন নিতান্ত ত্রস্ত লজ্জায় ছোট এক টুকরো খাবার তুলে নিল।

আশ্চর্য তো! রুমি মনে মনে ভাবলো। যুবকটি তাহলে মিঃ গাঙ্গুলির পরিচিত? মিঃ গাঙ্গুলির নিমন্ত্রণেই এখানে এসেছে? রুমির আরো মনে পড়লো, সরোবরের ধারে, মিঃ গাঙ্গুলির পাশেই যুবকটিকে ও প্রথম দেখেছিল। এখানেও মিঃ গাঙ্গুলির পাশেই। অথচ অপলক দৃষ্টি রুমির প্রতি। হ্যাঁ, এখানে অধিকাংশের দৃষ্টিই রুমি সেনের দিকে। তবু. আরো অনেক সুন্দরী এখানে উপস্থিত আছে। রুপোলী পর্দার নায়িকা এবং বাইরের নিমন্ত্রিত। তাদের দিকেও অনেকের অনেকে ঝুঁকে পড়েছে তাদের দিকেও। হাসি হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে।

হঠাৎ মিউজিক থামলো। কিছুক্ষণ বিরতি, খাবারের জন্য। হলের একপাশে সুদীর্ঘ টেবিলের উপরে খাবার প্লেট, ফর্ক আর ন্যাপকিন সুচারু রূপে সাজানো ছিল। মাথুরজী রীতিমতো ব্যুফে ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু রুমি সচকিত হয়ে আবিষ্কার করলো, উজ্জ্বলকুমার ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, হলের পার্শ্ববর্তী ঘরের নিরালায়। যদিও যথার্থ নিরালা বলতে কোথাও তেমন স্থান আপাতত নেই। রুমি তাকালো উজ্জ্বলের চোখের দিকে। পুরুষের চোখ! আর এ সময়ে পুরুষ মাত্রেই প্রেমিক। কিন্তু অনায়াসে পিছলে সরে যাওয়াটাও রুমির একটা

স্বকীয় প্রতিভা। ও দ্রুত উচ্চারণ করলো, "সরি উজ্জ্বল, এক মিনিট। আসছি।" বলেই ঝটিতি এক হাতে ম্যাক্সি একটু তুলে, হল ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

রুমি হল ঘরে ঢোকা মাত্র হা হা করে মিঃ মাথুর, কে. কে. দেওড়া এবং আরো অনেকেই ওর দিকে ছুটে এলেন। বলতে গেলে, ওকে ঘিরে নিয়েই সবাই খাবারের টেবিলের দিকে নিয়ে চললেন। মাথুরজী বললেন, "জয়েন উইথ আস্ মিস্ সেন।"

রুমি মিঃ গাঙ্গুলির কাছে যাবার জন্যেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওকে মাথুরজী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে খাবারের দিকেই যেতে হলো। কোথায় নিজেকে সংযত রাখতে হয়, কোথায় কতোখানি ব্যস্ততাকে সামলাতে হয়, রুমি এ সব ওর নিজের জীবনযাপনের ধারা থেকেই শিখেছে। খাবার টেবিলের সামনে গিয়ে ও আশা করলো, সেখানে মিঃ গাঙ্গুলির দেখা পাবে। কিন্তু পেল না, দেখলো, মিঃ গাঙ্গুলি তখনো দূরে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুবক, তার দৃষ্টি রুমির প্রতি।

আশ্চর্য! যুবকের চোখ দুটি কি রুমির চেনা? লোকটির নিতান্ত শ্রীহীন পোশাকের অবয়বের মধ্যে কি একটা পুরনো ছায়াকে হঠাৎ ভেসে উঠতে দেখা গেল? কিন্তু রুমি ভাববার অবকাশ পেল না। মুহূর্তেই ও হোস্টেসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। সকলের হাতে হাতে প্লেট চামচ আর ন্যাপকিন তুলে দিল। মাথুরজী হা হা করে উঠলেন, "আহা, করছেন কি মিস সেন?"

রুমি অমায়িক হেসে বললো, "এটা তো আমারই কাজ মিঃ মাথুর। ভাবুন, আমার বাড়িতে হলে, আমিই তো সবাইকে আপ্যায়ণ করতাম।"

সমবেত স্বরে শোনা গেল, "গ্রেট! রুমি সেন ইজ গ্রেট।"

সঙ্গে সঙ্গে রুমিকে ঘিরে একটা ভিড় জমে গেল। পরিচালক শ্রীসান্যালের পানের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বেশি হয়ে গিয়েছিল। তিনি

একেবারে রুমির সামনে হাঁটু ভেঙে বসে বললেন, "রুমি সেন, ইউ আর গডেস্!"

রুমি সচকিত ব্যস্ততায় ও লজ্জায় হেসে উঠে বললো, "ওহ্, মিঃ সান্যাল, কী করছেন? উঠুন, এই নিন প্লেট!" বলে একটি প্লেট এগিয়ে দিল।

কয়েকজন মিঃ সান্যালকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন, এবং তিনি প্লেট হাতে নিতেই, কেউ কেউ তাঁকে একটু ঠেলে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

রুমি যেন একটু অবাক হয়েই মিঃ মাথুরকে জিজ্ঞেস করলো, "মিঃ গাঙ্গুলি কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখছি না তো?"

মিঃ মাথুর যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "হোয়াট এ ব্লাণ্ডার! প্রডিউসর হিমসেলফ্ ইজ লস্ট?" বলেই তিনি ব্যস্ত ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন, এবং কিছু দূরে মিঃ গাঙ্গুলিকে দেখতে পেয়েই স্বর চড়িয়ে ডাকলেন, "হেই মিঃ গাঙ্গুলি, আওয়ার হিরোইন ওয়াণ্টস্ ইউ!"

রুমি কথাটা নিতান্ত ঠাট্টাচ্ছলে নিয়ে হাসলো। আসলে ও ভেবেই কথাটা বলেছে। ও জানতো, কথাটা বলেই মাথুরজী হাঁক ডাক লাগিয়ে দেবেন। আর গাঙ্গুলিও তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। ঘটলোও তাই। মিঃ গাঙ্গুলি দূর থেকে হাত তুললেন, ইশারায় জানালেন, আসছেন। তারপর যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে এবং যুবকটিকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। রুমি প্লেট নিয়ে প্রথমে মিঃ গাঙ্গুলিকে দিল, তারপর অতিথিকে, তারও পরে যুবককে। আশ্চর্য, যুবককে প্লেটটা হাতে তুলে দিতে গিয়ে, চকিতের জন্য একবার তার মুখের দিকে তাকিয়েই, মুখ ফিরিয়ে নিতে হলো। অন্য কোনো কারণে না, নিতান্ত লজ্জায়। যুবকের চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী দেওড়া দ্রুত এগিয়ে এসে রুমির ভূমিকা নিলেন, এবং একটি প্লেট তুলে দিতে গেলেন ওর হাতে। রুমি হাত জোড়

করে বললো, "মাফ করবেন মিসেস দেওড়া, আমার এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একটা সফট্ ড্রিংক কিছু নেবো, তেষ্টা পাচ্ছে।"

মিসেস দেওড়া নিজেই দ্রুত চলে গেলেন। রুমি দেখলো. মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে যুবকটি খাবার টেবিলের গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মিঃ গাঙ্গুলি তাকে কিছু বলছেন। নিশ্চয়ই খাবার নেবার জন্যই অনুরোধ করছেন, আর তাঁর উক্তি কিছুটা শোনা যাচ্ছে, "আরে আমার কি আর খাবার জো আছে? হাই প্রেসার, কলেস্টরেল, ব্লাডসুগার, কী নেই? এখন খালি চোখ দিয়েই খেতে হয়।"

মিঃ গাঙ্গুলির কথার শেষে যুবক পিছন ফিরে রুমির দিকে দেখলো। রুমিও তাকিয়েছিল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। মিসেস দেওড়া গেলাসে এ্যাপেল জুস্ এনে দিলেন রুমিকে। মিঃ গাঙ্গুলি প্লেটে নামমাত্র খাবার নিয়ে সরে এলেন ভীড়ের বাইরে। যুবকটিও তাই করলো, এবং মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গেই হলের অন্য দিকে এগিয়ে গেল।

রুমি আর কৌতূহল চাপতে পারলো না। এই সুযোগে মিঃ গাঙ্গুলির সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের চকিত ইশারায় যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না মিঃ গাঙ্গুলি?"

মিঃ গাঙ্গুলি যেন সহসা বুঝেই উঠতে পারলেন না, বলে উঠলেন, "কে?" তারপর রুমির দৃষ্টি অনুসরণ করে যুবকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ওহ, তুমি অবনীশের কথা বলছো? ও হচ্ছে আমার ছোট ভাই রণেন্দ্রনাথের বন্ধু অবনীশ চ্যাটার্জী।"

রুমি যেন অন্যমনস্ক আচ্ছন্নতার ঘোরে উচ্চারণ করলো, "অবনীশ চ্যাটার্জী?" অবনীশ নামক যুবকটির চোখ রুমির প্রতি। এই প্রথম তাঁর ঠোঁটে কিছুটা অপ্রস্তুত আর দ্বিধার হাসি ফুটলো। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "অবনাশ অবিশ্যি ফিল্ম জগতের লোক নয়, বরং বলা

যায় বিপরীত জগতের লোক। ও হচ্ছে সিভিল—আই মীন এঞ্জিনীয়ার, আর্কিটেক্ট এঞ্জিনীয়ার। ওকে বলা যায় মিস্‌-গাইডেড ট্যালেণ্ট।"

"মিস-গাইডেড ট্যালেণ্ট?" রুমি অন্যমনস্ক অথচ জিজ্ঞাসাসূচক স্বরে বললো, ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো।

মিঃ গাঙ্গুলি খানিকটা ঠাট্টার ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "তা ছাড়া ওর সম্পর্কে আমি আর কী বলতে পারি। আমার ধারণা মডার্ণ আর্কিটেক্টে ওর জুড়ি নেই। বোম্বাই মাদ্রাজ নানা জায়গা ঘুরে এখন কলকাতায় এসে বসেছে। আমার ছোট ভাই রণেনের অফিসেই বসছে, কিন্তু কারোর সঙ্গেই ওর মত মেলে না।"

"কী রকম?" রুমি কথাটা জিজ্ঞাস করলো যেন অবনীশেরই অপ্রস্তুত হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালো মিঃ গাঙ্গুলির দিকে।

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "কী রকম আবার? আজকাল যে-সব মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, বা ম্যাসিভ অফিস বিল্ডিং, মানে যাদের হাতে টাকা, যারা কাজ করায়, তাদের সঙ্গে শ্রীমান অবনীশের কিছুতেই মতের মিল হয় না। নাকি হে অবনীশ, ঠিক বলছি তো?" তিনি হেসে অবনীশের দিকে তাকালেন।

অবনীশ মুখচোরা লাজুক হেসে বললো, "কী করবো বলুন গাঙ্গুলিদা। টাকা থাকলেই সকলের রুচি থাকে না। একটা বিল্ডিং খাড়া করতে অনেকেই পারে, বাট ছাট ইজ অলসো এ্যান আর্ট। একটা মনের মতো কাজ যদি না করতে পারি, নতুন ধরণের কিছু, তা হলে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটা কোথায়? খালি টাকা?" সে যেন জিজ্ঞাসু চোখ ফিরিয়ে তাকালো রুমির দিকে।

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "তা হলে এ রকম ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াও, তা নইলে চলে যাও ইউ-কে অথবা আমেরিকায়। এক মাত্র সেখানেই আর্কিটেক্ট জীনিয়সের কদর হবে।"

রুমি অবনীশের দিকে তাকিয়ে ছিল। অবনীশ ওর দিকে ফিরে তাকাতেই একটু যেন অপ্রস্তুত হলো, আর খানিকটা দ্বিধা করে মিঃ গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু উনি ভিন্ন জগতের লোক, তবে আমাদের এ সৌভাগ্য কেমন করে হলো যে, এই পার্টিতে ওঁর আগমন হয়েছে?"

মিঃ গাঙ্গুলি রুমি সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন, ওর কথায় বা চোখে মুখে কোনো বিরক্তি বা বিদ্রূপ আছে কিনা। সে-রকম কিছু তাঁর মনে হলো না। বললেন, "আমাদের সৌভাগ্য? আমাদের সৌভাগ্যের আর কী আছে? তুমি তো জানোই, আমার ভাই রণেনও একজন আর্কিটেক্ট এঞ্জিনিয়ার, কিন্তু একেবারে কাঠখোট্টা মিস্তিরি।" বলতে বলতে হেসে উঠলেন, "তোমার বার্থ-ডে পার্টিতে আমার ভাইকেও আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তার আসবার সময় হলো না। ওই যে বললাম, একেবারে কাঠখোট্টা মিস্তিরি। আর অবনীশ হঠাৎ নিজে থেকেই আমাকে বললো, ও তোমার বার্থ-ডে পার্টিতে আসতে চায়। বুঝলাম, অবনীশ এঞ্জিনীয়র হলেও, রুমি সেনের একজন ফ্যান।"

রুমি তাকালো অবনীশের দিকে। অবনীশও তাকিয়েছিল। রুমি জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি?"

অবনীশ জোর দিয়ে বললো, "নিশ্চয়ই। তোমার—সরি, আপনার ফ্যান কে নয়?"

মিঃ গাঙ্গুলির ভুরু কুঁচকে উঠলো, চোখে জিজ্ঞাসা। রুমি সেন দ্রুত বলে উঠলো, "আপনি করে না বললেও চলবে! আমি ফ্যানের কথা বলি নি, আসতে চাওয়ার কথাটাই জিজ্ঞেস করছি, সত্যি?"

অবনীশ চকিতে একবার মিঃ গাঙ্গুলির ভ্রূকুঞ্চিত জিজ্ঞাসু মুখের দিকে দেখে বললো, "সত্যি আসতে ইচ্ছে হয়েছিল, যদিও আমি জানি, আমি এ পরিবেশে একেবারেই মূর্তিমান বেমানান, তবু সত্যি আসতে ইচ্ছে হয়েছিল। মিথ্যে বলবো কেন?"

রুমি বললো, "হয়তো মিথ্যে নয়, তবু হঠাৎ এত কাল পরে—ঠিক আশা করতে পারি নি। চিনি চিনি মনে হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।"

অবনীশ বললো, "স্বাভাবিক। দিনকালের মতো, তোমার—সরি, আপনার—।"

"আহ্., অবনীশ। ডোণ্ট মেক এ ফার্স।" রুমি বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "আমাকে তুমি কখনো আপনি করে বলতে না, আমিও না।"

মিঃ গাঙ্গুলি ভ্রূকুঞ্চিত অবাক চোখে একবার রুমি, আবার ফিরে অবনীশের দিকে অসহায় বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন।

অবনীশ হেসে বললো, "তবে আবার সরি! বলতে চাইছিলাম, সব কিছুর মতো আমিও এত বদলে গিয়েছি, তোমার পক্ষে আমাকে না চিনতে পারাই স্বাভাবিক।"

"একেবারে চিনতে পারি নি, তা নয়, চিনি চিনি মনে হচ্ছিল।" রুমি বললো, "কিন্তু তুমি তো আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলে, কাছে এসে কথা বলতে পারতে।"

অবনীশ চোখ কপালে তুলে, দু' হাত দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বললো, "আমি? আমার মতো একটা হ্যাগার্ড তোমার সঙ্গে যেচে কথা বলতে যাবে? তারপরে তুমি আমাকে স্নবিং দাও, আর কি!"

"কেন, আমি কি দানবী নাকি?" রুমি ঘাড় বাঁকিয়ে, ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো।

অবনীশ হেসে বললো, "না না, দানবী কেন হবে? তবে মানবীও নও।"

"মানবী নই?" রুমির ভুরু কুঁচকে উঠলো।

অবনীশ বললো, "না, তুমি দেবী।"

"দেবী!" রুমি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো, "তুমিও সকলের মতো কথা বলছো?"

অবনীশ কিছু জবাব দেবার আগেই, মিঃ গাঙ্গুলি আর থাকতে না পেরে, দুজনের মাঝখানে এসে পড়লেন, হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা দুজনেই বাপু আমাকে বেজায় ধাঁধায় ফেলে দিলে দেখছি। তোমাদের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না? তোমাদের মধ্যে কি আগে থেকে চেনা পরিচয় আছে নাকি?"

অবনীশ আর রুমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। রুমি বললো, "মিঃ গাঙ্গুলিকে জবাব দাও।"

অবনীশ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে আবার চোখ কপালে তুলে বললো, "আমি জবাব দেবো? তোমার সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় ছিল কী না, সে-কথার জবাব একমাত্র তুমিই দিতে পারো। আমার সে-সাহস কোথায়?"

"সাহস?" রুমি অবাক চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে অবনীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

অবনীশ বললো, "নিশ্চয়। রুপোলী জগতের অদ্বিতীয়া নক্ষত্র রুমি সেনকে আমি আগে থেকে চিনি, গাঙ্গুলিদা আমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে বিশ্বাস করবেন কেন?"

রুমি কিছু বলতে গিয়েও খিল খিল করে হেসে উঠলো। মিঃ গাঙ্গুলি তাঁর মোটা ভুরু জোড়া কাঁপিয়ে বললেন, "না না, হাসির কথা নয়, হাসির কথা নয়। অন্তত অন্য সময় অবনীশ আমাকে এ কথা বললে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না। সত্যি কথা বলতে কি, এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।"

অবনীশ রুমিকে বললো, "দেখলে?"

রুমি তাকালো মিঃ গাঙ্গুলির দিকে, বললো, "অবিশ্বাস করার কী কারণ থাকতে পারে মিঃ গাঙ্গুলি? অবনীশের সঙ্গে কি আমার পরিচয় থাকতে পারে না?"

মিঃ গাঙ্গুলি কিছুটা যেন অসহায় ভাবেই বললেন, "থাকতে হয় তো পারে। সংসারে অনেক কিছুই সম্ভব। কিন্তু তুমি হলে রুমি সেন

আর এ হলো চাল-চুলোহীন এক বেকার আর্কিটেক্ট। আমি তো মোটেই খেই ধরতে পারছি না!"

রুমি একবার তাকালো অবনীশের দিকে, তারপর মিঃ গাঙ্গুলির দিকে ফিরে বললো, "মিঃ গাঙ্গুলি, আমার আজকের জীবনটার পেছনে কোনো ট্রাডিশান নেই, আমার একটা অতীত ছিল।"

"কিন্তু সেই অতীতটা আদৌ সুখের নয়।" অবনীশ বলে উঠলো, "এতদিনে তা পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবারই কথা।"

রুমি একটু গম্ভীর হলো, একটু বা অন্যমনস্ক। বললো, "একেবারে মিথ্যে বলো নি। কিন্তু অবনীশ, কালো মেঘের বুকেও বিজলী হানে। আমার অতীতের অনেকটাই অন্ধকার, তবু তার মধ্যেও কিছু কিছু আলোর রেখার ঝিলিক আছে। এয়ারপোর্টের সার্চলাইটের মতোই তা অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে। তা নইলে, এ পরিবেশে তোমাকে চেনা চেনা ঠেকতো না।"

"বিউটিফুল!" মিঃ গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, "খুব ঠিক কথা! আর রুমি সেনের মতো শিল্পীই এ কথা মনে রাখতে পারে, বলতেও পারে।"

রুমি সেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হেসে বললো, "থ্যাংক্যু মিঃ গাঙ্গুলি, ফর ইওর কমপ্লিমেন্টস্।"

মিঃ গাঙ্গুলি শশব্যস্ত ভাবে বললেন, "আরে এতে আবার কমপ্লিমেন্টস্-এর কী আছে। যা সত্যি, তাই বললাম। তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়ালো? তোমার একটা অতীত ছিল, আর সেই অতীতে—!"

"অবনীশ ছিল।" রুমি হেসে বলে উঠলো।

মিঃ গাঙ্গুলি হাত তুলে বলে উঠলেন, "ফাইন! কিন্তু কী ভাবে ছিল?" তাঁর চোখের পাতা নিবিড় হলো।

"আপাতত বলা যায়, একটি ভূতের মতো।" অবনীশ বলে উঠলো।

রুমির ঘাড়ের ঝটকায় ওর ঘাড়ের নীচে আবাঁধা খোলা চুলের গোছা গালে এসে ঝাপটা খেল, বললো, "মোটেই না। অবনীশ, বাজে কথা বলো না। অবিশ্যি বাপ মা হারা, কাকার ঘাড়ের বোঝা সেই মেয়েটিকে তুমি তখন খুবই কৃপার চোখে দেখতে।"

অবনীশ তৎক্ষণাৎ আহত বিস্ময়ে ডেকে উঠলো, "রমা !"

রুমি অবনীশের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসলো, "সরি অবনীশ ! হয় তো একটু স্নেহও করতে।"

"উঁ হুঁ হুঁ, ঘুলিয়ে যাচ্ছে।" মিঃ গাঙ্গুলি হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "তোমরা অন্য কথায় চলে যাচ্ছো, আমার কথার জবাব পেলাম না।"

রুমি সকৌতুকে হেসে বললো, "এত কথা শুনেও আপনার কথার জবাব পেলেন না ? তা হলে শুনুন। আমার কুড়ি বছর বয়স অবধি আমি সিঁথিতে আমার কাকার বাড়িতে থেকেছি। আর সেই বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকতো, লেখাপড়ায় খুব ভালো, এক সুবোধ বালক এই অবনীশ চট্টোপাধ্যায়। আমার থেকে কিছু বড়। কিন্তু দাদা-টাদা বলা আমার ধাতে ছিল না। কী, ঠিক বলেছি ?" ও অবনীশের দিকে তাকালো।

"অনেকটাই।" অবনীশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, "সুবোধ বালকের আসল ডেফিনেশন হচ্ছে হাঁদা বোকা। ওটা ঠিকই বলেছো ! কিন্তু লেখাপড়ায় আমি কোনো কালেই ভালো ছিলাম না।"

রুমি বললো, "ওটা তোমার বিনয়।"

মিঃ গাঙ্গুলি অবনীশের মুখের সামনে তর্জনী তুলে বললেন, "তুমি তো ভারি মিসচিভাস্ ছোকরা হে ! আমাকে তো একবারও বলো নি, রুমি সেনকে তুমি চেনো ?"

অবনীশ তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললো, "এই তো একটু আগেই বললাম দাদা, সাহস পাই নি। আমি আসলে রুমি সেনের অতীত অকারের—।"

"একটি ভূত!" রুমি বাধা দিয়ে বলে, খিলখিল করে হেসে উঠলো, "আসলে তুমি কায়া না ছায়া, দেখি তো।" বলে আঙুল দিয়ে অবনীশের বুকে স্পর্শ করলো।

অবনীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাথুরজী এবং আরো কয়েকজন ছুটে এলেন। মাথুরজী বললেন, "এখানে কী নাটকটা ঘটছে, বুঝতে পারছি না তো?"

কোনো কোনো মহিলা পুরুষ এগিয়ে এলেন খাবার প্লেট হাতে, মুখে খাবার নিয়েই। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "তা এক রকম নাটকই বলতে পারেন।" অবনীশকে দেখিয়ে বললেন, "এর নাম অবনীশ চ্যাটার্জি। একজন মডার্ণ আর্কিটেক্ট। হঠাৎ-ই আবিষ্কার করা গেল, আমাদের রুমি সেনের সঙ্গে অতীতে এর পরিচয় ছিল।"

উজ্জ্বলকুমার ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, "এটা কোনো নাটকই নয়। অতীতের চেনাশোনাদের হঠাৎ হঠাৎ এ রকম দেখা পাওয়া যায়, বাট ইট ডাজ্ নট ম্যাটার!"

পাশ থেকে একজন স্যুটেড বুটেড ব্যক্তি বলে উঠলেন, "একজাক্টলি!"

অবনীশের দিকে তাকিয়ে অনেক মহিলা পুরুষেরই, অরুচিতে ঠোঁট বেঁকে, নাক কুঁচকে উঠলো। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। আবার নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে বিরূপ কথাবার্তাও বললো।

রুমি ঠোঁটে চোখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বললো, "হোয়াট ম্যাটার্স এ্যাণ্ড হোয়াট নট, উজ্জ্বলকুমার নিশ্চয়ই তা ভালো বোঝেন। আমার অতীতটা অবিমিশ্র সুখের নয় ঠিকই, কিন্তু আমি একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না। সাম টাইম ইট ম্যাটার্স টু মি!"

রুমির কথায় সকলের চোখে মুখেই কিছুটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটলো। উজ্জ্বলকুমারকে দেখালো কিছুটা ম্লান, সে ঝুঁকে নীচু স্বরে বললো, "রুমি, আমি তোমাকে কিন্তু হার্ট করতে চাই নি।"

মাথুরজী স্বর চড়িয়ে হাল্কা ভাবে বললেন, "মিস রুমি সেন ঠিকই বলেছেন, পাস্ট ইজ নট ওনলি পাস্ট, সাম টাইম ইট ম্যাটার্স। কিন্তু মিস সেন, এবার আপনি আসুন, যা হোক একটু মুখে দিন। তারপরেও আমরা আপনার বার্থ-ডে পার্টি আর একটু এনজয় করবো। আসুন।" তিনি রুমির হাত ধরে টানলেন। সবাই মাথুরজীকে সমর্থন করে হৈ হৈ করে উঠলো।

রুমি বিনীত ভাবে বললো, "জাস্ট এ মিনিট মাথুরজী, আপনারা চলুন, আমি এখুনি আসছি।"

"ওক্কে! লেট আস্ মুভ।" মাথুরজী সবাইকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "মিউজিক প্লিজ।"

মিউজিক শুরু হলো, আর তারই মধ্যে, বিব্রত অবনীশের দিকে তাকিয়ে রুমি বললো, "এখনো কি সেখানে—মানে, সিঁথিতেই আছো?"

অবনীশ বললো, "না, দাদারা সব অকর্মণ্য জেনে আমাকে ত্যাগ করেছেন। ধর্মতলায় এক বন্ধুর সঙ্গে ছোট একটি ঘরে ভাগাভাগি করে থাকি।"

রুমি চোখের পাতা একবার নত করলে, আবার চোখ তুলে বললো, "ইচ্ছে করলে, মাঝে মধ্যে তুমি তো আমার ওখানে আসতে পারো।"

অবনীশ যেন তটস্থ হয়ে বললো, "কোথায়? তোমার বাড়িতে?"

"কেন, ইচ্ছে করে না?" রুমি ঘাড় বাঁকালো।

অবনীশ বিষণ্ণ হেসে বললো, "ইচ্ছের প্রমাণ তো আজই পেলে।"

"তা হলে এ রকম প্রমাণ মাঝে মধ্যে বাড়ি গিয়েও দিতে পারো।" রুমি আবার অন্য দিকে ঘাড় কাত করে বললো।

অবনীশ বললো, "সাহস দিচ্ছ?"

"না, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" রুমি হেসে বললো।

অবনীশ বললো, "তোমাকে যেন এ কথায় ঠিক মানাচ্ছে না।"

"জীবনটাই তো বেমানান।" রুমি যেন নিজের মনেই হাসলো, এবং মুখ ফিরিয়ে মিঃ গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মিঃ গাঙ্গুলি, আমাদের এ ছবিটার এডিটেড পোরশানের প্রোজেকশান কবে আছে?"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আগামী সপ্তাহের বুধবারে, সন্ধ্যা ছটায়।"

রুমি বললো, "আপনি তো নিশ্চয়ই ল্যাবরেটারিতে আসছেন। অবনীশকেও নিয়ে আসবেন।"

অবনীশ অস্বস্তিতে বলে উঠলো, "রমা!"

রুমি কিছু বলবার আগেই, মিসেস দেওড়া এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "জলদি আসুন, আপনার জন্ম আমরা ক্ষেপে উঠেছি।"

রুমি অবনীশের দিকে একবার হাত তুলে চলে গেল। অবনীশ অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আরে এটা তো গ্রেট অনার হে! আমি তোমাকে ল্যাবরেটারিতে নিয়ে যাবো।"

অন্যমনস্ক অবনীশ চমকে মিঃ গাঙ্গুলির দিকে তাকালো, বললো, "আজ্ঞে?"

অন্যদিকে সমবেত স্বরে উচ্চারিত হলো, "হ্যাপি বার্থ-ডে টু রুমি সেন।"

নতুন করে আবার টোস্ট এবং নৃত্য শুরু হলো।

রুমি সেনের বাড়ির বন্ধ গেটের সামনে, মাথুরজীর ডাব্‌ল হেডলাইট জ্বালানো বিদেশী গাড়ির হর্ণ বেজে উঠলো। গেটম্যান তাড়াতাড়ি সশব্দে গেট খুলে দিল। বাগানের পাশে মোরাম বিছানো পথের

ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো পোর্টিকোয়। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। রুমি সেন বাইরে নেমে দাঁড়ালো। এখন ওর ম্যাক্সির বুকে জড়ানো একটি বাটিকের কাজ করা সিল্কের উত্তরীয়।

গাড়ির দু'দিকের দুই দরজা দিয়ে নামলেন মাথুরজী আর মিঃ গাঙ্গুলি। মাথুরজীর চোখের পাতা ভারি এবং লাল। এখন তাঁকে ভিন্ন মানুষ মনে হচ্ছে। যদিও তিনি যথেষ্ট সহজ ভাবে দাঁড়াতে চাইছেন, পারছেন না। মৃদু বাতাসে দোলার মতো দুলছেন। তাঁর রক্তাভ চোখের দৃষ্টি রুমির দিকে। মিঃ গাঙ্গুলি এগিয়ে এলেন। এখন তাঁর চোখেও যেন একটা ব্যাকুলতা।

মাথুরজী রুমির একটা হাত ধরলেন, তারপর নিঃশব্দ স্তব্ধ অন্ধকার বাগান আর বিশাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে, কিছুটা জড়ানো স্বরে বললেন, "হোয়াট এ ফ্রাইটফুল সাইট! হরিবল্! ইজন্ট ইট মিঃ গাঙ্গুলি?"

মিঃ গাঙ্গুলি জবাব দেবার আগেই, রুমি ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করলো, "ভয়ংকর দৃশ্যটা কী দেখলেন মাথুরজী?"

"নয়?" মাথুরজীর মাথা হেলে পড়লো, "মিস সেন, এত বড় বাড়িটার মধ্যে তুমি একেবারে একলা থাকো। তোমার হয় তো ভয় করে না, কিন্তু এটা একটা ভয়ের দৃশ্য নয় কী? এ্যাট লিস্ট, ইট ইজ হার্ট একিং।"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "ঠিক বলেছেন মাথুরসাহেব, এটা একটা ব্যথার কথা।"

রুমির বুকটা কি দীর্ঘশ্বাসে ফুলে উঠতে যাচ্ছিল? কিন্তু ও নিপুণ হেসে বললো, "আমি কিন্তু খুব ভালোই থাকি মাথুরজী। সকলের জীবন তো এক রকম হয় না।"

"অফ কোর্স, দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্সেস বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড আদার উওমেন। কিন্তু ঈশ্বরও লোনলিনেস সহ্য করতে না পেরে

মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই নয় কি মিঃ গাঙ্গুলি?" মাথুরজী সাক্ষী মানবার জন্য, মিঃ গাঙ্গুলির বিপরীত দিকে ঘাড় বাঁকালেন।

মিঃ গাঙ্গুলি সায় দিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। নিঃসঙ্গতার মতো যন্ত্রণা আর কী আছে?"

রুমি তেমনিই হেসে বললো, "ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, তাতে তাঁর একাকীত্ব কতোখানি ঘুচেছে, তিনিই জানেন। কিন্তু ঈশ্বরই পৃথিবীতে কিছু নরনারীকে নিঃসঙ্গ করেই সৃষ্টি করেছেন।"

মাথুর রুমির হাতটা একেবারে প্রায় তাঁর ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়েও, নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন. "মিস সেন, আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না, কিন্তু মনে রেখো, আদমের একাকীত্বের জন্য ঈশ্বর ইভের সৃষ্টি করেছিলেন।"

"খুব সত্যি কথা।" মিঃ গাঙ্গুলি তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

রুমি বললো, "ঠিকই বলেছেন মাথুরজী। আর সেই থেকেই তো মানুষের জীবনে শাশ্বত সংকটের শুরুও, তাই না?"

মাথুরজী যেন জুড়িয়ে গেলেন, বললেন, "শাশ্বত সংকট? ইউ মীন, ইটারনাল ক্রাইসিস?"

"খুব ঠিক কথা।" মিঃ গাঙ্গুলি আবার বলে উঠলেন, "মাথুর সাহেব, রুমি সেনের সঙ্গে আমরা কথায় পারবো না।"

মাথুরজী একবার টলে গিয়ে, হাত তুললেন, বললেন, "ঠিক কথা। মিস্ সেন, আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না। কিন্তু একটা কথা আমি না বলে পারছি না। তোমার একটা বিয়ে করা উচিত।"

"খুব ঠিক কথা।" মিঃ গাঙ্গুলি তাঁর বাঁধা বুলিতে সায় দিলেন।

রুমি হাসলো, অথচ ওর চোখে মুখে ক্লান্তি ও ব্যস্ততা। বললো, "কাকে বিয়ে করবো? কে আমাকে বিয়ে করবে?"

"হোয়াট!" মাথুরজী মস্ত বড় একটি হাঁ করলেন, "তুমি কাকে বিয়ে করবে? কে তোমাকে বিয়ে করবে?"

মিঃ গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, "তুমি যাকে বিয়ে করতে চাইবে, সে-ই তোমাকে বিয়ে করে ধন্য হবে।"

"এমন কি বিবাহিত ব্যক্তি তার বউকে ডিভোর্স করেও তোমাকে বিয়ে করবে, ঠিক বলি নি মিঃ গাঙ্গুলি ?"

মিঃ গাঙ্গুলির এক জবাব, "খুব ঠিক কথা মাথুরজী।"

রুমি হেসেই বেশ দৃঢ়স্বরে বললো, "আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি খুবই টায়ার্ড, একটু বিশ্রাম চাই।" ও পিছন ফিরে কলিং বেল টিপলো, আবার মুখ ফিরিয়ে বললে, "কিছু মনে করবেন না, পরশু থেকেই তো আবার কয়েকদিন টানা শুটিং আছে। পরে একদিন এ সব নিয়ে কথা বলা যাবে।"

"খুব ঠিক কথা।" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন।

মাথুরজী বললেন, "বেশ, তাই হবে, কিন্তু কথাটা নিয়ে ডিস্‌কাস্‌ করতেই হবে।" বলতে বলতে তিনি গাড়ির ভিতরে ঢুকে এলিয়ে পড়ে বললেন, "গুডনাইট মিস সেন, হেইল ত্থ হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ এগেন।"

রুমি হাত নেড়ে বললো, "থ্যাংক্যু, গুডনাইট।"

"চলি তা হলে রুমি।" মিঃ গাঙ্গুলি হাত তুলে বললেন, তারপর ঢুকলেন গিয়ে গাড়ির ভিতরে।

রুমি বললো, "আসুন।"

গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠে হেডলাইট জ্বলতেই, রুমির দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি শান্তশীলা যুবতী মেয়ে, রুমির খাস দাসী যাকে বলা যায়। সুদীর্ঘ ঢাকা বারান্দার দূরের বাঁকে মাঝবয়সী পুরনো ভৃত্য সতীশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথুরজীর গাড়িটা ঘুরে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে, হেডলাইটের আলো চকিতে একবার রুমিকে ছুঁয়ে গেল।

রুমি দরজার ভিতরে পা দিয়ে, গা থেকে খুলে নিল বাটিকের কাজ করা সিল্কের উত্তরীয়টি। ও খাস দাসী নমিতার হাতে উত্তরীয়টি বাড়িয়ে দেবার আগেই, নমিতা নিজেই হাত বাড়িয়ে সেটি নিল। রুমি বললো, "তোমরা সব বন্ধ-টন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ো।"

রুমির মুখে এখন ক্লান্তির থেকেও যেন একটা শূন্যতা নেমে আসছে। মাথুরজী মিথ্যা বলেন নি, এই বিশাল বাগান বেষ্টিত প্রাসাদোপম বিশাল ভবনে, নিঃসঙ্গতা যেন গ্রাস করতে আসে। বাড়িটাকে এই রাত্রে, এখন মনে হচ্ছে যেন এক স্তব্ধ পাষাণপুরী। বাগান থেকে স্পষ্ট ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক, এই দক্ষিণ ঘেঁষা মধ্য কলকাতায় যা অবাস্তব বলে মনে হয়।

ঢাকা বারান্দার খোলা অলিন্দগুলো এখন চিক দিয়ে ঢাকা। চওড়া বারান্দার প্রবেশ মুখের কয়েক গজ দূরে, বেশ বড় দুটো কাঠের ঘোড়া। বিষ্ণুপুরের মাটির ঘোড়া থেকে এর আকৃতি, গঠন আর শিল্পশৈলী ভিন্ন। যে-শ্রেণীর কাঠ দিয়ে এ ঘোড়া তৈরি, তার স্বাভাবিক রঙ যেন অনেকটা উজ্জ্বল দুধ গরদের মতো। আর কোনো রঙ নেই, কেবল দুই ঘোড়ার পিঠের ওপরে দুটি কারুকাজ করা সওয়ার আসন।

রুমির ভাস্কর্যের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। শান্তিনিকেতন থেকে আনা রামকিংকরের মোরাম আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের নরনারীর যুগল মূর্তি ছাড়াও, ঘরের দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে, ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি অতুলনীয় পাথরের দেবদেবীর মূর্তি। দেওয়ালের বুকে অল্প কয়েকটি পট।

রুমি সে-সব কিছুই দেখছে না। ওর চোখে মুখের শূন্যতার মধ্যে, ক্রমেই নেমে আসছে যেন একটা আচ্ছন্নতা। ওর এই মুহূর্তগুলোকে দাস-দাসীরা বুঝে নিয়েছে। ও নিজের থেকে কারোকে না ডাকলে, কিছু না বললে, কেউ সামনে আসে না, কিছু বলতেও পারে না। ভাস্কর্য আর মূর্তিগুলো যেন করুণ নির্বাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে

আছে। ও আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। পাশের সব ঘরগুলোই বন্ধ। বাঁদিকে বাঁক নিয়ে, আর এক সুদীর্ঘ বারান্দা, খোলা অলিন্দ চিকে ঢাকা।

বারান্দার বাঁকের মুখে, এক পাশে বিরাট ডাইনিং রুম। দরজার কাছে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পাচক গৌরাঙ্গ আর খানসামা সুধীর। ওদের চোখ নত। তারপরেই, একটি ঘরের খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সী পুরনো ভৃত্য সতীশ। রুমি একবার সকলের মুখের দিকে তাকালো, অথচ ওর শূন্য দৃষ্টি কারোকেই যেন দেখলো না। কিছু বলবে ভেবেও যেন বলা হলো না। নমিতা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, দূরত্ব বজায় রেখে রুমির পিছনে পিছনে আসছে। রুমি সতীশের পাশ দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। অনেকটা যেন আচ্ছন্ন আর সম্মোহিতের মতো ও তিনটি ঘর অতিক্রম করে, চতুর্থ ঘরটির পর্দা তুলে ঢুকলো। প্রত্যেকটি ঘরের আসবাব এবং শয্যার সঙ্গে, এ ঘরের অনেক প্রভেদ। এ ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর, রুমির সাজপোশাক জামা-কাপড় পরার। অন্য দিকে এ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। দেওয়ালে একটিই মাত্র ছবি, যামিনী রায়ের মা ও সন্তান। ওরজিনাল পেন্টিং থেকে তেলরঙের নকল। কিন্তু ডাব্‌ল বেডেড খাটের সুসজ্জিত-বিছানা দেখলে অবাক হতে হয়। পাশাপাশি যুগল শয়নের বালিশ। তার একটির পাশে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে একটি শিশু, যার গলা অবধি লাল লিনেন চাদরে ঢাকা।

রুমি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে বিছানার দিকে তাকালো। বিছানা থেকে চোখ তুলে তাকালো দেওয়ালের মা ও সন্তানের ছবির দিকে। আবার চোখ নামিয়ে বিছানার দিকে। যেন স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের একত্র বিছানা। রুমি এবার যেন একটু দ্রুত বিছানার কাছে গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালো। যুগল শয্যা থেকে ওর দৃষ্টি সরে এলো শায়িত ঘুমন্ত শিশুর দিকে। ও নত হয়ে, হাঁটু পেতে বসে, শিশুর মুখের দিকে

মুখ নিয়ে গেল। ঠোঁট ছোঁয়ালো শিশুর গালে। আস্তে আস্তে শিশুর গায়ের চাপা খুলে দিল। একটি দু-তিন বছরের শিশুর মাপের পুতুল, যার গায়ে সুন্দর পোশাক পরানো। পায়ে লাল টুকটুকে জুতো।

রুমির চোখে স্নেহ ব্যাকুলতা। ও পুতুলটির আপাদমস্তক এমন ভাবে দেখতে লাগলো যেন একটা জীবন্ত শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে। রুমির ঠোঁট দুটি নড়ে উঠলো, যেন শিশুটিকে আদর করে ডাকলো। তারপরে চোখ তুলে একবার দেখলো যুগল শয্যার দিকে। আবার ওর ঠোঁট নড়ে উঠলো। যেন কেউ শুয়ে রয়েছে, তাকেই কিছু বললো। অথচ শূন্য শয্যা।

রুমি সেখান থেকে চোখ সরিয়ে আবার তাকালো অপরূপ শিশুটির দিকে। ওর স্নেহ ব্যাকুলতা যেন করুণ আর আর্ত হয়ে উঠলো। ঘুমন্ত শিশুর গায়ে যেমন করে অতি সন্তর্পণে হাত বুলোয় তার মা, তেমনি করে হাত বুলিয়ে দিল পুতুলের সারা গায়ে। গালে গাল চেপে রইলো খানিকক্ষণ, এবং সহসা ওর দুই চোখের কোণে জলের বিন্দু ফুটে উঠলো। একটা উদ্‌গত কান্নাকে ও যেন কিছুতেই চাপতে পারলো না, কিন্তু পাছে শিশুর ঘুম ভেঙে যায়, এমনি ভাবে দ্রুত তার গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে ও উঠে দাঁড়ালো। চোখ বুজে দু' হাতে গলাটা চেপে ধরলো, তারপরে যেন একটা অস্থির ব্যাকুলতায় দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বারান্দা দিয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে, দরজা খুলে খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালো। নিঝুম রাত্রি। সীমাহীন আকাশের কৃষ্ণ চাঁদোয়ায় অজস্র নক্ষত্রের বুটি চুমকির মতো ঝিকমিক করছে।

রুমি যেন বড় অসহায় কান্নায় ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে তাকালো। গভীর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ওর চোখে মুখে। ওর নিঃশব্দ কান্না যেন আর্তস্বরে, তরঙ্গায়িত হতে লাগলো সীমাহীন চরাচরে।

পরের দিন সকাল প্রায় দশটা। রুমি একলা ডাইনিং টেবলে। সামনে একটি গ্লাসে ফলের রস। সুধীর প্রাতঃরাশ পরিবেশন করছে। সতীশ কয়েকটি ইংরেজি আর বাঙলা দৈনিক এনে রুমির সামনে রাখলো।

রুমিকে দেখলেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই ওর স্নান সারা। চৈনিক মহিলাদের মতো, লাল রঙের ঢোলা পায়জামা আর শার্ট ওর পরণে। চুল খুলে আঁচড়ানো। এখন ও কোনো প্রসাধন করে নি। কিন্তু ওকে দেখাচ্ছে স্নিগ্ধ, শিশিরে ভেজা ফুলের মতো তাজা। ফলের রসের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে, ও দৈনিক পত্রিকাগুলো টেনে নিল। একটা ইংরেজি দৈনিকের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে রেখে দিল। একটা বাঙলা দৈনিক টেনে নিয়ে দেখলো। সেটাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে রেখে দিল। টেনে নিল আর একটি বাঙলা দৈনিক। কলকাতার সব থেকে নাম করা দৈনিকটির তৃতীয় পাতা খুলতেই, মাঝারি হেডিংটা ওর চোখে পড়লো, "প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর জন্মদিনে আতসবাজী।" স্টাফ রিপোর্টার সংবাদটি পরিবেশন করেছেন, "গতকাল প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রুমি সেনের জন্মদিন উপলক্ষে, কলকাতার মানুষ লেকের ধারে সন্ধ্যারাত্রে একটি অভিনব আতসবাজীর উৎসব প্রত্যক্ষ করলেন। আয়োজনটি করেছিলেন, বিশিষ্ট পরিবেশক ও প্রযোজক, যথাক্রমে শ্রী বি. আর. মাথুর এবং শ্রী আর. এন. গাঙ্গুলি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না শ্রীমতী সেন এখন একটি ডাব্‌ল ভার্শান রঙীন ছবির নায়িকা হিসেবে, এঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।

কলকাতার মানুষ সচরাচর এ রকম জন্মদিনের অভিনব অনুষ্ঠান দেখেন নি। যখন আতসবাজীর রঙীন অক্ষরমালায় "রুমি সেনের শুভ জন্মদিনে" ঝলকিত হয়ে উঠেছিল, তখন বহু প্রত্যক্ষদর্শী, ধ্বনি ও করতালি সহযোগে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই যুগন্ধর মহিলা শিল্পীর জনপ্রিয়তা এখনো অম্লান ও ক্রমবর্ধমান। গত

সন্ধ্যারাত্রে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস থেকেই প্রমাণিত হলো, তিনি এখনো দেশবাসীর বিশেষ প্রীতিধন্যা।...ইত্যাদি।"...

"গুডমর্ণিং ম্যাডাম।" একটি সুশ্রী শ্যামাঙ্গিনী তরুণী, পরিচ্ছন্ন শাড়ি জামায় সজ্জিতা, রুমির সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে দুটি ফাইল।

রুমি চোখ তুলে তাকিয়ে হেসে জবাব দিল, "মর্ণিং। এই সংবাদটা দেখুন মিস দাস।" খবরের কাগজটা ও তরুণীর দিকে এগিয়ে দিল।

মিস দাস বললো, "খবরটা আমি আমার বাড়িতেই সকালে পড়েছি, আর কাটিংটাও নিয়ে এসেছি। অফিসের প্রেস কাটিং-এর ফাইলে রেখে দিয়েছি।"

রুমি হেসে বললো, "আপনি দেখছি মোর দ্যান এ সেক্রেটারি। বসুন। ফাইলে কী আছে?"

মিস দাস একটি চেয়ারে বসে বললো, "বিশেষ কিছু না। গোটা কয়েক চিঠির জবাব, আপনার কথা মতো টাইপ করা হয়ে গেছে, সেগুলো সই করে দেবেন। সলিসিটর মিঃ মুখার্জি দু' কপি টাইপ করা চিঠি গতকাল পাঠিয়েছেন, আপনার সই হয়ে গেলে, ওঁর অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। বম্বের বিলাওনি ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজের মিঃ বিলাওনি আজ বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতায় এসে পোঁছোচ্ছেন। তিনি পোঁছেই ফোন করবেন, তখন জানাতে হবে, আপনি কোথায় কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। প্রিভিয়াস ট্রাঙ্ক-কলে আপনাদের মধ্যে কথা হয়েছিল।"

রুমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, "মনে আছে। মিঃ বিলাওনিকে এখানেই আসতে বলবেন। হোটেলে গিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই।"

"অলরাইট।" মিস দাস একটি ফাইল খুলে, স্লিপে নোট করলো। কিছু চিঠিপত্র আর কলম এগিয়ে দিল রুমির দিকে।

রুমি প্রত্যেকটা চিঠিতেই দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে সই করে দিল। মিস দাস বললো, "আরো কিছু চিঠিপত্র এসে পড়ে আছে, সেগুলো আজই দেখে নেবো। আগামীকাল সকাল দশটায় স্টুডিও থেকে গাড়ি আসবে আপনাকে নিয়ে যেতে। এ্যাজ ইউজুয়্যাল, আননোন্ ভিজিটার্স আর নট এ্যালাউড ?"

রুমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, অন্যমনস্ক মুখে, চিঠিগুলো সই করে মিস দাসের দিকে সরিয়ে দিতে গিয়ে যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো। খানিকটা আপন মনেই উচ্চারণ করলো, "এ্যাঁ ? আননোন্ ভিজিটার্স ?" বলতে বলতে ও দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, বারান্দায় রাখা টেলিফোনের দিকে। যে টেলিফোনটার নাম্বার গাইডে নেই, একমাত্র রুমির অত্যন্ত ব্যক্তিগত কিছু লোক ছাড়া, যে নাম্বার বাইরের সাধারণ লোকের জানবার উপায় নেই। যদিও নাম্বারটা ততোধিক গোপন রাখা সম্ভব হয় নি। কারণ প্রায়ই আশ্চর্য অচেনা স্বুরের ডাক ভেসে আসে, গাইডে নাম-না-ছাপা টেলিফোনেও, এবং সেই সব অচেনা স্বরের মালিকরা অধিকাংশই রুমি সেনের অতি ভক্তের দল। এর থেকে একটা ব্যাপারই প্রমাণিত হয়, রুমি সেনের আনঅফিসিয়াল টেলিফোন নাম্বারটাও, অতি ভক্তের দলের কাছে অনাবিষ্কৃত নেই।

রুমি বাইরের ঢাকা বারান্দায় রাখা টেলিফোন থেকে চোখ সরিয়ে এনে বললো, "যদি বিশেষ একজন আননোন ভিজিটার আমার পার্সোনাল টেলিফোনে কল না করে, আপনার কাছে খোঁজ করে, তাকে আমার পার্সোনাল নাম্বারটা জানিয়ে দেবেন। নাম অবনীশ চ্যাটার্জি।"

মিস দাস তৎক্ষণাৎ নামটা নোট করে নিয়ে, রুমির সই করা চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হেসে বললো, যাচ্ছি। "খুব দরকার না পড়লে, আপনাকে আপাতত আর ডিসটার্ব করছি না।"

রুমিও হেসে বললো, "থ্যাংক্যু।"

মিস দাস ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল। রুমি টোস্টে মাখন মাখালো। একটি কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে বাইরে তাকালো। চিক এখন খোলা। ঢাকা বারান্দার অলিন্দ দিয়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। রুমির দৃষ্টি অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো। অন্যমনস্ক ভাবেই ও এক টুকরো সসেজ মুখে দিল। এক চামচ ক্রামবল্ড এগ্। তারপরই কফির পট থেকে কাপে কফি ঢেলে দুধ মিশিয়ে, সুগার কিউব ফেলে নাড়তে লাগলো। খাবারে ওর রুচি নেই, এমন কথা বলা যায় না, অথচ খেতে ইচ্ছা করছে না। কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে ওর চোখে পড়লো, বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছের উঁচু ডালে, দুটি পায়রা, পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে যেন চুম্বন করছে। হঠাৎ একটি পায়রা সরে গিয়ে উড়ে গেল। বাকি পায়রাটি দেখতে লাগলো। রুমি দেখলো, উড়ে যাওয়া পায়রাটি মাটিতে নেমে একটি শুকনো কাঠির টুকরো মুখে নিয়ে আবার উড়লো। ওর বাড়ির সীমানায়, পাশের বাড়ির পিছনের দিকের জানালার সানসেটের ওপরে গিয়ে উঠে বসলো। যেখানে বসলো, সেখানে ছোট একটি খোপ। পায়রাটি বারকয়েক সানসেটের ওপর পাক খেয়ে খোপের মধ্যে ঢুকলো। আর তার পাশ দিয়েই একটি কচি শাবকের ব্যাকুল ছোট মুখ দেখা দিল।

এই সময়ে গাছের ডাল থেকে অপর পায়রাটিও উড়ে গিয়ে খোপের সামনে সানসেটের ওপরে গিয়ে উঠলো। খোপের মধ্যে একবার মুখ ঢুকিয়ে, বাইরে পাক খেতে লাগলো। এখন তার ভঙ্গি অনেকটা সাবধানী পাহারাদারের মতো। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গলা ফোলানো গর্বিত পায়রাটি পুরুষ, ভিতরেরটি নারী, যার ডিম ফুটে সদ্য বাচ্চা ফুটেছে।

রুমি দেখলো, দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেল। কাপ নামিয়ে রেখে, খানিকটা আচ্ছন্নের মতো খাবার টেবিল থেকে উঠে, পাশের ঘরে গেল। তিনটি ঘর পার হয়ে, গত রাত্রের সেই চতুর্থ ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। সেই যুগল শয্যা,

পাশে লিনেনের চাদরে ঢাকা পাশ ফেরানো শিশু। দেওয়ালে যামিনী রায়ের সেই বিখ্যাত পেন্টিং-এর নকল, মা ও সন্তানের ছবি। নিভাঁজ বিছানাটি দেখলেই বোঝা যায়, গত রাত্রে সেখানে কেউ শোয় নি। নিতান্তই সাজানো; একটি স্মৃতির মতো, যেন একটি দ্রষ্টব্যমাত্র। যেন কোনো এক কালে কেউ ছিল, এক দম্পতী আর তাদের শিশু সন্তান। আজ কেবল স্মৃতি।

আসলে তা না। সন্তান যেমন মায়ের ইচ্ছে হয়ে থাকে মনের মাঝারে, ঘরটি সেই রকম। রুমির অন্তঃস্তলের একটি সুপ্ত আর সুগভীর ইচ্ছা, রূপ ধরে সাজানো রয়েছে। শুধু সাজানোই আছে। থাকবেও ততোকাল, যতোকাল না রুমির জীবনে এই শয্যার সংকেতটা বাস্তব হয়ে উঠবে। এ ঘর প্রতীক্ষা করে রয়েছে এক অনাগত দিনের পথ চেয়ে। সেই দিনটি না আসা পর্যন্ত, রুমির ইচ্ছেটা এমনি করে সাজানো থাকবে। রুমি নিজেও কখনো এ ঘরে একলা শোয় না। পাশের ঘরের একাকী শয্যায় ওর নিঃসঙ্গ রাত্রি কাটে।

কিন্তু কবে এই শয্যার সংকেত বাস্তব হয়ে উঠবে? যার জীবনের চারপাশে এত মৌমাছির গুঞ্জন, কবে তার জীবনে সেই প্রজাপতির পাখায় লাগবে কাঁপন? রক্তের শিরায় শিরায় ধ্বনিত হবে সন্তানের আগমন?

রুমির চোখে মুখে আচ্ছন্নতা গাঢ়তর হলো। ও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকিয়ে দাঁড়ালো। ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো। পিছনে যেন কারো পায়ের শব্দে ওর ধ্যান ভেঙে গেল। ও পিছন ফিরে তাকালো।

সুধাময়ী অপ্রস্তুত করুণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার সামনে। রুমি বিরক্ত হতে গিয়েও, অপ্রস্তুত হেসে বললো, "ওহ্, তুমি!"

সুধাময়ী ঘরে ঢুকলেন না। দরজার কাছ থেকেই বললেন, "খেয়ালই করি নি, যে এ ঘরে এসে পড়েছি। তোকে ওদিকে না দেখে—।"

"তাতে কী ?" রুমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

সুধাময়ী তথাপি একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "রাগ করলি ?"

"এ কথা তুমি বলছো ?" রুমি অবাক স্বরে বললো, "তোমাকে আমি মা বলে ডেকেছি। নিজের মাকে তো মনেও করতে পারি না। তোমার ওপর রাগ করবো, আমি ?"

সুধাময়ী তথাপি বললেন, "তবু মানুষের মনের কথা তো বলা যায় না। অনেক সময় নিজের পেটের সন্তানও মায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অমন হয়েই থাকে।"

রুমি করুণ হেসে বললো, "সে-কথা তুমিই ভালো জানো। মা আর সন্তানের মনের কথা আমি কেমন করে বুঝবো ?"

সুধাময়ী জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। সহসা কোনো কথা তাঁর মুখে এলো না। রুমির কথার অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কোনো জবাব না দিয়ে তিনি সাজানো শয্যার দিকে তাকান। গম্ভীর আর করুণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখ।

রুমির প্রাণের মর্মমূল থেকে কথাটি আপনা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসার সুরে একটা ব্যথার ব্যঞ্জনা। ও নিজেও শয্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দুই অসমবয়সী রমণী, কারোর মুখেই খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। একজন ঘরের মাঝখানে, আর একজন দরজায়।

কয়েক মুহূর্ত পরে রুমিই নিজেকে সামলে নিল। একটি উদগত দীর্ঘশ্বাস চেপে, ঈষৎ হেসে সুধাময়ীকে ডাকলো, "মা, আসবে না ?"

সুধাময়ী তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। যেন রুমির কথা শুনতে পেলেন না। রুমি আবার বললো, "তোমার তো এ বাড়ির কোনো ঘরে ঢুকতে বারণ নেই।"

"জানি।" সুধাময়ী বললেন, "বারণ থাকলে তোর লোকজনেরা আমাকে এদিকে আসতে দিতো না। কিন্তু রুমি, তোর এই ঘরে আমার একেবারেই ঢুকতে ইচ্ছে করে না।" বলে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন।

রুমি অবাক হলো না, তবু জিজ্ঞেস করলো, "কেন মা?"

"আমার বুকের মধ্যে কেমন করে।" সুধাময়ী বললেন, "আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।"

সুধাময়ীর কথা শুনে, এ মুহূর্তে, এ ঘরে রুমিরও যেন দম বন্ধ হয়ে এলো। কিছু বলতে পারলো না।

সুধাময়ী আবার বললেন, "আমাকে যেন ভুল বুঝিস না রুমি। মা বলে যখন ডেকেছিস, তখন বুঝতে পারিস, কেন এ ঘরে এলে আমার বুক ফেটে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।"

"জানি জানি।" রুমি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, ঘাড় বাঁকালো।

সুধাময়ী রুমির একটি হাত টেনে ধরে বললেন, "জানিস যদি, তবে কতোকাল আর এই সাজানো ঘর নিয়ে কাটাবি?"

রুমি কোনো জবাব দিল না। তাকালো দেওয়ালের ছবির দিকে, সাজানো শয্যার বুকে। সুধাময়ী আবার বললেন, "আমার তো সেই পুরনো কথা, তোকে কতোদিনই বলেছি। ছেলে আর মেয়ে বলে, জীবন কারোর আলাদা নয়। মানুষ, সে যতো বড়োই হোক, যতো ছোটই হোক, জীবনের একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্মটা সবাইকেই মেনে চলতে হয়। নইলে পদে পদে অনাসৃষ্টি।" বলে তিনি রুমির হাত ছেড়ে দিয়ে, নিজের দু' হাত বিস্তৃত করে বললেন, "আমাকে ছাখ।"

রুমি যেন স্বপ্নিল আবেশে দেখলো, সুধাময়ীর সিঁথির সিঁদুর, কপালের ফোঁটা, হাতের নোয়া আর শাঁখা। তিনি আবার যেন করুণ হেসে বললেন, "আমি আজকের রুমি সেন না হতে পারি, এককালের সুধাময়ী দেবী তো? ওরে, জীবন ছাড়া তো শিল্প নেই। বড় শিল্পী

হওয়া যেমন বড়ো কথা, তেমনি স্বামীর সংসার করা, সন্তানের মা হওয়াও অনেক বড়ো কথা। এখনো কাজ ছেড়ে যাই নি, কিন্তু সংসার সন্তান বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারি নে।"

"তোমার কোনো কথাই তো অস্বীকার করি না মা।" রুমি বললো, "যদি তাই করবো, তবে এমন করে সব সাজিয়ে রাখবো কেন?"

সুধাময়ী আবার রুমির হাত ধরে বললেন, "তাও বুঝি, কিন্তু কেবল সাজিয়ে রাখলে তো হবে না জানিস না, প্রতিমা শুধু গড়লেই হয় না, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।"

"তাও জানি মা।" রুমি করুণ হেসে বললো, "কিন্তু সকলের ভাগ্য তো এক রকম হয় না। তোমার জীবনের ঠিক সময়টিতে তুমি যেমন দুটি শক্ত বিশ্বাসী হাতের সন্ধান পেয়েছিলে, সকলেই কি তা পায়?"

সুধাময়ী বললেন, "তা যদি বলিস মা, তা হলে বলি, সে যে সব সময়ে আপনি এসে ধরা দেয়, এমন বড় হয় না। বরং ধরা দেবার জন্যই অনেকে ওৎ পেতে থাকে। সেইখানটিতে ভুল হলে, সব সর্বনাশ। নিজের মন আর চোখ খোলা রেখে, ঠিক মানুষটিকে চিনে নিতে হবে।"

"সেই কথাই তো বলছি মা।" রুমি বললো, "আমার চারপাশের পরিবেশে, সেই মানুষটিকে চিনে নেওয়া যে বড় কঠিন। এ সংসারকে তো তুমি আমার থেকে কিছু কম চেনো না? মনে হয় চারদিকেই যেন চোরাবালি, কোথাও পা ফেলতে ভরসা পাই না।"

সুধাময়ী রুমিকে এক হাতে বেষ্টন করে, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে অনেকটা সহজ ভাবে বললেন, "বুঝি রুমি, বুঝি! মিথ্যে কিছু বলিস নি। কিন্তু জীবনটা কেবল চোরাবালিতে ঘেরা নয়, শক্ত মাটিও আছে, যেখানে নিশ্চিন্তে পা রাখা যায়। জীবনটা ফুলে ফলে ভরে ওঠে। তা নইলে তো মানুষের জীবনটাই মিথ্যে হয়ে যেতো।"

সুধাময়ী কথা বলতে বলতে রুমিকে নিয়ে অন্য ঘর দিয়ে বাইরে চলে এসেছিলেন। রুমি সহসা নীচু হয়ে সুধাময়ীকে প্রণাম করে বললো, "মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মতো শক্ত মাটির ঠাঁই আমি পাই।"

সুধাময়ী সচকিত হয়ে, হেসে, রুমিকে শশব্যস্ত স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে, তার জন্য আমার পায়ে তোকে হাত দিতে হবে কেন। আমি এমনিতেই তোকে আশীর্বাদ করছি। আমি সব সময়ে প্রার্থনা করি, নিজের সাধনায় তুই যেমন বড় শিল্পী হয়েছিস, তেমনি তোর মেয়ে-জীবনটিও যেন সবদিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।" পর-মুহূর্তেই কপট গাম্ভীর্যে বললেন, "কিন্তু হ্যাঁ গো রুমি, আমি এসেই খাবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সকালের জলখাবার কিছুই মুখে দিস নি। সুধীরকে নমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা বললো, মেমসাহেব খেতে খেতে হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। এ রকম করলে কি আর শরীর বাঁচে?"

রুমি হাসলো। বারান্দা দিয়ে যাবার সময়, পায়রা উড়ে যেতে দেখা গেল। রুমি সে বিষয়ে কিছু না বলে জবাব দিল, "খেতে খেতে কী মনে হয়েছিল, উঠে চলে গেছলাম। এখন আবার খিদে পাচ্ছে। তোমার কাছে বসে খাবো, চলো।"

সুধাময়ী হেসে বললো, "এবার দেখছি, আমাকে এসে তোকে ঠিক মতো খাইয়ে পরিয়ে যেতে হবে।"

আবহাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠলো। সুধাময়ীকে খাবার টেবিলে বসিয়ে, রুমি পাশের চেয়ারে বসে বললো, "তুমি কী খাবে মা, বলো।"

সুধাময়ী বললেন, "কিছু না। আজ আমার লাঞ্চের পরে বিকেল পর্যন্ত শুটিং আছে। গতকাল তোর আতসবাজী আর মাথুরজীর পার্টিতে আসতে পারি নি বলে মনটা একটু খচ্ খচ্ করছিল। তাই একবার চলে এলাম।"

"ও-পার্টিতে তুমি না আসায়, আমি কিছুই মনে করি নি মা। আমার আসল জন্মদিন তো বিকেলে তুমিই করেছো।" রুমি বললো, "কিন্তু কিছুই খাবে না কেন ?"

সুধাময়ী হেসে বললেন, "কর্তাকে হাইকোর্টে পাঠিয়ে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে কলেজে পাঠিয়ে, নিজেও কিছু মুখে দিয়ে এসেছি।"

"ওহ্, তাই আর এ মেয়ের বাড়িতে কিছু মুখে দিতে পারবে না।" রুমির স্বরে, চোখে মুখে অভিমান ফুটে উঠলো।

সুধাময়ী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "ওরে না না, তা নয় মোটেই। আমার খিদে নেই, তাই। আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে, চা তো আমি এক কাপ খাবোই। তোর ইচ্ছে মতো আরো না হয় কিছু খাবো। হলো তো ?"

রুমি হেসে উঠে বললো, "আচ্ছা, তুমি একটু চা খেলেই আমি খুশি।" বলে ও পিছন ফিরতেই, খানসামা সুধীর রান্নাঘরের দরজার কাছ থেকে বলে উঠলো, "আমি চা নিয়ে আসছি।"

রুমি ফিরে সুধাময়ীকে হাসতে হাসতে বললো, "জানো মা, গতকাল রাত্রে মাথুরজী আর গাঙ্গুলিসাহেব আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। তাঁদের তুজনেরই খুব ইচ্ছে, আমি এখুনি বিয়ে করি। আমি বললাম, আমাকে কে বিয়ে করবে ? ওঁরা তুজনেই বললেন, আমি যাকে চাইবো সে-ই বিয়ে করবে। দরকার হলে আগের বউকে ডিভোর্স করেও আমাকে যে-কেউ বিয়ে করবে!" রুমি কথার শেষে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সুধাময়ী হেসে উঠলেন, বললেন, "এ সব তো বাঁধা গত্। আমার জীবনে মহারথীদের কাছ থেকে আমিও এ রকম কথা কম শুনি নি। কিন্তু একটা কথা তখন যেন কেমন করে বুঝে নিয়েছিলাম।"

"কী কথা ?" রুমি উৎসুক অনুসন্ধিৎসায় জিজ্ঞেস করলো।

সুধাময়ী বললেন, "বুঝেছিলাম, আমাদের শিল্পীদের জীবনটা বড়ো একপেশে, জগতটা ছোট। বড়ো মাপের সংসারটা যেখানে সুখে তুঃখে

ছড়িয়ে আছে, নিজেকে সেই সংসারের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে জীবনের স্বাদটা পাওয়া যাবে না। তাতে হয়তো প্রফেশনের দিকটা অনেক সময় মার খেতে পারে। তা খেলেই বা কী আসে যায়? আমি তো ভেবেই নিয়েছি, জীবনটাই আগে। জীবনের থেকে অভিনয় বড়ো না, জীবনের জন্যই তো অভিনয়।"

"আর সেইজন্যই তুমি চোরাবালিতে পড়ো নি।" রুমি যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে বললো, "সেটাই তোমার ক্ষমতা, সেখানেই তুমি খাঁটি।"

সুধাময়ী লজ্জিত হেসে বললেন, "অমন করে বলিস না। তবে হ্যাঁ, এমন কথাও বলি না, আমাদের এই ছোট জগৎটায় বড়ো মাপের সংসারের মানুষ নেই। আছেন। তাঁদের স্নেহ ভালোবাসার মূল্যও কম নয়। কিন্তু আমাকে তো দেখতে হবে, আমাকে পেয়ে, সংসারের সব কিছু ভুলে, একটা মানুষ যেন নিজেকে নষ্ট না করেন?"

"এত কথা এমন করে ভাববার অবকাশ তুমি কেমন করে পেলে মা?" রুমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

সুধাময়ী বললেন, "এমন কথা তো কিছু নয়। খুবই স্বাভাবিক কথা। একটু ভাবলে তুইও বুঝতে পারবি।"

সুধীর খানসামা এসে সুধাময়ীর সামনে, ট্রে থেকে টি-পট আর কাপ ডিস ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে গেল। রুমি অন্যমনস্ক মুখে বললো, "হয় তো ঠিক বলেছো, কিন্তু তোমাদের যুগের সঙ্গে আমাদের যুগটার অনেক তফাত। তোমরা যে সহজ কথাকে সহজ ভাবেই বুঝতে পারতে আমরা বোধ হয় তা আর পারি নে।"

সুধাময়ী তাঁর চায়ের কাপে চা ঢেলে পটটা সরিয়ে রেখে, বেশ শক্ত মুখে বললেন, "হ্যাঁ। আর আমার সহজ কথাটা হলো, রুমি সেনকে আর আমি এভাবে দেখতে চাই নে।"

রুমি সেন হতভম্ব বিস্ময়ে শব্দ করলো, "অ্যাঁ!"

"অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ।" সুধাময়ী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলেন। রুমিও হেসে উঠলো।

স্টুডিও চত্বরের মধ্যে, ল্যাবরেটারির প্রোজেকশান রুমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মাথুরজী, মিঃ গাঙ্গুলি, পরিচালক শ্রীসান্যাল। সহ-পরিচালক প্রলয় ঘোষও দাঁড়িয়ে আছেন। গেটের মাথার ওপরের উজ্জ্বল আলোয়, দেখা যাচ্ছে, সকলের চোখে মুখেই ব্যস্ততা। কোনো গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে এলেই, সকলের চোখগুলো তীক্ষ্ণ আর অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠছিল। আর পর মুহূর্তেই হতাশা ফুটে উঠছিল।

স্টুডিও চত্বরে নানা লোকের আনাগোনা। এই সন্ধ্যারাত্রি সাতটার পরেও, এডিটিং-এর কাজকর্ম চলছিল ভিতরের কোনো বিল্ডিং-এ। বোধ হয় কোনো ফ্লোরে শুটিংও চলছিল।

মাথুরজী হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "মিস সেন ঠিক জানেন তো, আজ সন্ধ্যা সাতটায় প্রোজেকশন আছে?"

"নিশ্চয়ই।" সান্যাল বললেন, "আজ সকালেও আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।"

কবজির ঘড়ি দেখলেন মিঃ গাঙ্গুলিও, বললেন, "তাছাড়া প্রোজেকশানের দিনক্ষণ গত সপ্তাহেই ঠিক হয়ে গেছলো, রুমি সবই জানতো।"

"কিন্তু কোনো কাজেই রুমি তো অকারণ এ রকম দেরি করে না?" সহ-পরিচালক প্রলয় বলে উঠলো, "এমন কি উজ্জ্বলদাও এসে গেছেন, সব কাজেই যিনি লেট করেন।"

"লেট কী হে, এখন অলরেডি সাড়ে সাতটা।" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আজ শুনেছি, আরো দুটো ছবির প্রোজেকশান আছে। আমাদের শীডিউলড্ টাইম পেরিয়ে গেলে, আজ আর প্রোজেকশান দেখা হবেই না।"

সান্যাল বললেন, "আমাদের যতোক্ষণের প্রোজেকশান, তার তুলনায় সময় অনেক বেশিই নেওয়া আছে। আমি ভয় পাচ্ছি, হঠাৎ যদি লোড শেডিং হয়ে যায়, সব বরবাদ হয়ে যাবে।"

"যতো সব অলুক্ষুণে কথা!" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "ও সব কথা মুখে আনতে আছে? আপনার ওদিকে সব ঠিক আছে?" বলে হাত দিয়ে পিছনে দেখালেন।

সান্যাল বললেন, "প্রোজেক্টার মেসিন? সব রেডি। খালি স্টার্ট বলার অপেক্ষা।"

মাথুরজী আবার ঘড়ি দেখলেন, মিঃ গাঙ্গুলির দিকে ফিরে বললেন, "একবার টেলিফোন করে দেখলে হতো না?"

"আশ্চর্য, কথাটা আমার মাথায় এসেও যেন আসছিল না।" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "যান তো মিঃ সান্যাল, স্টুডিওর অফিস থেকে একটা—।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, সান্যাল হাত তুলে নির্দেশ দিলেন, "প্রলয়, তুমি যাও তো।"

সহ-পরিচালক প্রলয় দৌড় দিল, আর সেই মুহূর্তেই ছুটো হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো যেন তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রলয় সরে যাবার আগেই ব্রেক কষার শব্দ হলো। গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেতেই, দরজা খুলে, রুমি ভিতর থেকে ছিটকে নামলো। প্রলয় চিৎকার করলো, "এসে গেছেন!"

মাথুরজী, মিঃ গাঙ্গুলি এগিয়ে যাবার আগেই, রুমি শাড়ির আঁচল আর চুল একসঙ্গে উড়িয়ে, প্রায় ছুটে গেটের কাছে এলো, বললো, "এ্যান এ্যাকসিডেন্ট!"

"এ্যাকসিডেন্ট?" মাথুরজীর স্বরে উদ্বেগ।

মিঃ গাঙ্গুলি রুমির আপাদমস্তক দেখে, উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, "কোথায়? কী ভাবে?"

সান্যাল অধিকতর উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় লেগেছে আপনার?"

রুমি এক মুহূর্ত চোখ বুজে, যেন দম নেবার জন্যই, চুপ করে থেকে মাথা নাড়লো, তারপরে বললো, "এ্যাকসিডেন্ট রাস্তায়, লেগেছে

অন্যের, আমি অক্ষত, কিন্তু ফলে পড়ে গেলাম প্রচণ্ড গোলমাল আর জ্যামের মধ্যে।"

"ওহ্, দ্যাট ওয়াস্ট সিন্ অব্ ক্যালকাটা।" মিঃ গাঙ্গুলি উচ্চারণ করলেন "কলকাতার এই জ্যাম, জীবনটাকে—।"

"প্লিজ, ডোন্ট মেক এনি জ্যাম হিয়ার অন দ্য গেট।" মাথুরজী হেসে, রুমি সেনকে দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে ঢোকবার ইশারা করে বললেন, "প্রসিড অন্ প্লিজ।"

রুমি ঢোকবার আগে মুখ ফিরিয়ে বললো, "মিঃ সান্যাল, আপনার এ্যাসিস্টেন্টের লাগলো কী না, একবার দেখে নেবেন কাইণ্ডলি।"

পিছন থেকে প্রলয় আকর্ণ হেসে বললো, "খুব জোর বেঁচে গেছি ম্যাডাম, আমার একটুও লাগে নি।"

রুমি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেল, মিঃ গাঙ্গুলি বলছেন, "সান্যাল, যান, তাড়াতাড়ি স্টার্ট করতে বলুন।"

রুমি প্রোজেকশানের মিনিয়েচার হলে ঢুকলো। ওর পাশে পাশে মাথুরজী। ভিতরের আলো তেমন উজ্জ্বল না, তবু অনেকগুলো চেনা মুখই ভেসে উঠলো। উজ্জ্বলকুমার হাত তুলে রুমিকে অভ্যর্থনা জানালো। রুমি হাত তুলেই তার জবাব দিল। মাথুর এগিয়ে গেলেন আসনের দিকে। সামনের সারির কয়েকটি আসন শূন্য, যার একটিতে উজ্জ্বলকুমার বসে আছে। প্রোজেকশান হলের সামনের আসনগুলোই সাধারণত বিশিষ্টদের জন্য থাকে।

মাথুরজী ব্যস্ততার সঙ্গে রুমিকে একটি আসনে বসতে অনুরোধ করলেন, "প্লিজ সিট ডাউন মিস সেন।"

রুমি বসবার আগে একবার পিছনের আসনের অস্পষ্ট মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ওর পাশেই বসলেন মাথুরজী। সিগারেট হাতে মিঃ গাঙ্গুলি এসে বসলেন আর এক পাশে। সান্যাল হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ল্যাবরেটারির দিকে মুখ করে স্বর চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রেডি ?"

দেওয়ালের ওপার থেকে জবাব এলো, "অনেকক্ষণ।"

"স্টার্ট করুন।" সান্যাল বললেন।

আলো নিভে গেল। সান্যাল মিঃ গাঙ্গুলির পাশের চেয়ারে বসলেন। প্রলয় দ্রুত পিছনের দিকে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পর্দায় ছবি ফুটে উঠলো। আবহসঙ্গীতবিহীন, এডিটেড ছবির প্রিন্ট।

প্রথমেই দেখা গেল যানবাহন আর জনবহুল, চলমান ব্যস্ত, কলকাতার রাজপথ। একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো একটা সিনেমা হল আর তার পাশেই একটি সাধারণ রেস্তোরাঁর সামনে। ভিলেন চরিত্রের নাম করা অভিনেতা নীলোৎপল চৌধুরি আর রুমি ট্যাক্সির পিছনের সীটে বসে আছে।

গাড়ির ভিতরে নীলোৎপল আর রুমিকে ক্লোজে ধরা। নীলোৎপলের চোখের পাতা পিটপিট করছে, মুখে হাসি। রুমিকে দেখাচ্ছে কিছুটা ক্লিন্ন, ম্লান, উসকোখুসকো আর চোখে সংশয়। নীলোৎপলের ডায়লগ: "মায়া, চলো একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

রুমি: "আমার তেমন খিদে নেই।"

নীলোৎপল হেসে বলে, "তেমন না হোক, একটু তো আছে। ট্রেনে এতটা পথ এসেছো—কাল রাত্তির থেকেই তো কিছু খাওয়া হয় নি।"

রুমি সরল, কিছুটা বা লজ্জা মেশানো চোখে নীলোৎপলের দিকে তাকায়, বলে, "এ ভাবে তোমার সঙ্গে চলে আসবো, ভাবতেই পারি নি। ভয়ে আর ভেবে ভেবে খেতেই পারি নি।"

নীলোৎপল চকিতে একবার ধূর্ত চোখে ড্রাইভারের দিকে দেখে নিয়ে বলে, "বুঝেছি, বুঝেছি। ও সব কথা এখন থাক। সেইজন্যই তো একটু খেয়ে নেওয়া দরকার।"

রুমি: "কেন, তোমার—তুমি যেখানে থাকো, সেখানে গিয়ে খাওয়া যাবে না?"

নীলোৎপল হেসেঃ "তা যাবে না কেন? কিন্তু সেখানে তো আমার একলার সংসার, সব অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। এখানে সামান্য একটু যা হোক মুখে দিয়ে নাও, এসো।" দরজা খুলতে খুলতে ড্রাইভারকে বলে, "ভাই, একটু অপেক্ষা করুন. এই পাঁচ দশ মিনিট। একটু চা খেয়েই আমরা আসছি।"

ড্রাইভার কিছুটা অখুশি, বলে, "যান, কিন্তু বেশী দেরি করবেন না। অফিসের ছুটির সময়, এখন গাড়ি নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না।"

গাড়ির দরজা খুলে গেল। নীলোৎপল রুমির হাত ধরে টানলো, "এসো, নেমে এসো।"

দুজনেই নেমে আসে। আশপাশ দিয়ে ব্যস্ত লোকের চলাফেরা। নীলোৎপল এগিয়ে যায়। রুমি এগোতে গিয়েও যেন, লোকের চলাচলের ভিড়ে থমকে থাকে। আশেপাশে তাকায়। রেস্তোরাঁর দরজার কাছ থেকে নীলোৎপল ডাকে, "কী হলো মায়া, এসো।" বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে আসে। রুমির হাত ধরে লোকজনের পাশ কাটিয়ে নিয়ে যায়। বলে, "কলকাতার পথে এ রকম হাঁ করে দাড়িয়ে থাকলে হয়? রাস্তাব মাঝখানে হলে তো গাড়ি চাপা পড়ে মরবে।"

রুমি ঈষৎ হাসে, বলে, "কলকাতায় কি জীবনে কখনো এসেছি? এই তো প্রথম। এ যেন একেবারে মেলার ভিড়, লোকের পাশ কাটানো যায় না! আমি গ্রামের মেয়ে, গ্রামের পথেই চলতে পারি।"

নীলোৎপল হেসে বলে, "এর নাম কলকাতা। এখানে রাস্তায় ভিড় আর মেলা লেগেই আছে। এ শহরে ভিড় ঠেলেই চলতে হয়। ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা যায় না। এসো।"...

দৃশ্যান্তর। নীলোৎপল আর রুমি সিঁড়ি দিয়ে রেস্তোরাঁর দোতলায় ওঠে। রুমি অবাক হয়ে বলে, "ওপরে কোথায় যাচ্ছো? লোকজন সব তো নীচে বসে খাচ্ছে দেখলাম।"

নীলোৎপল হাসে : "ওপরেও খাবার জায়গা আছে। ওপরে ফাঁকা, নিরিবিলি, আরাম করে বসা যাবে। এসো।"

রুমি নীলোৎপলকে অনুসরণ করে।

দৃশ্যান্তর। ওপরের ঘর। রাস্তার দিকে জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। ঘরে গোটা ছয়েক টেবিল, আর টেবিল ঘিরে কিছু চেয়ার। টেবিলের ওপর পাতা টেবিল ক্লথ নামে যে-বস্তু রয়েছে, যেমন ময়লা, তেমনি জায়গায় জায়গায় ছেড়াখোড়া। ওপরের ঘরটা ফাঁকাই বলা যায়। মাত্র একটি টেবিলে তিনজন পুরুষ ও একটি মেয়ে বসে আছে। তাদের দেখলেই বোঝা যায়, সরকারি বা সওদাগরি অফিসের কর্মচারি। তারা রুমি আর নীলোৎপলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, আবার নিজেদের কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

নীলোৎপল রুমিকে নিয়ে এক কোণের একটি টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। বলে, "বসো।"

রুমি : "ওপরে এত ফাঁকা কেন ?"

নীলোৎপল : "ওপরে খাবারের দাম বেশি। যারা বেশি দাম দিয়ে খায়, তারাই ওপরে আসে। বসো।"

রুমি হাতলবিহীন একটা চেয়ারে বসলো। মুখোমুখি বসলো নীলোৎপল। পায়জামা আর শার্ট গায়ে একটি ছোকরা এসে দাঁড়ালো। হাতে খালি ট্রে আর ঝাড়ন। বললো, "কী দেবো স্যার ?"

নীলোৎপল : "কী আছে ?"

ছোকরা : "খাসীর কষা মাংস, দোপেঁয়াজী, কারি, চিকেন কারি, চিকেন দোপেঁয়াজী, মাট্‌ন চপ, কাটলেট, ফিস ফ্রাই—"

নীলোৎপল : "ব্যাস্ ব্যাস্, আর বলতে হবে না বাবা। আণ্ডা ফ্রাই, মাখন টোস্ট পাওয়া যাবে ?"

ছোকরা : "যাবে।"

নীলোৎপল : "তা হলে দু'প্লেট ডাবল আণ্ডা ফ্রাই, চার পিস মাখন টোস্ট, আর দু'কাপ চা, জলদি।"

ছোকরা ঃ "জলদি ।" বলেই চলে যায়।

নীলোৎপল রুমির দিকে তাকিয়ে হাসে। রুমির হাসিটি লজ্জিত আর বিব্রত। নীলোৎপল বলে, "একটু রিফ্রেশমেন্ট যাকে বলে। চট করে খেয়েই বেরিয়ে যাবো। তুমি কি বাথরুমে যাবে ?"

রুমি ঘাড় নাড়ে। নীলোৎপল উঠে দাঁড়ায়, বলে, "আমি তাহলে একটু বাথরুম ঘুরে আসি। চোখে মুখে একটু জল দেওয়া দরকার। তুমি বসো, আমি আসছি, অ্যাঁ ?"

রুমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়, বলে, "তাড়াতাড়ি এসো।"

নীলোৎপল সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলে, "নীচে যাবো আর আসবো।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

রুমি একলা, মাথা নীচু। অন্য টেবিলে হঠাৎ সমবেত উচ্চ হাসি। রুমি চমকে সেদিকে তাকায়। কিন্তু ওর দিকে কেউ তাকায় না, নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলে এবং হাসে।

টেবিলের কথাবার্তা। ১ম পুরুষ : "দ্যাখো গীতা, এটা তোমাদের বাড়াবাড়ি।"

মেয়েটি ঃ "কেন, বাড়াবাড়ি কিসের ? যা বলো আর তা বলো, রাত্তির দশটা অবধি আমি বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারবো না।"

২য় পুরুষ : "আরে দশটা অবধি তোমাকে কে আড্ডা মারতে বলছে। কিন্তু ছুটির পরেই তোমার যাই যাই, এটা ঠিক নয়।"

মেয়েটি ঃ "বেঠিকটা কিসের ? ছুটির পরে তোমাদের সঙ্গে একটু যে আড্ডা দিতে ইচ্ছে না করে তা নয়। কিন্তু বাড়িতে আমার ছেলেমেয়ে দুটি আমার পথ চেয়ে বসে থাকে।"

দৃশ্যান্তর ঃ রুমির টেবিল। ছোকরা বেয়ারা এসে খাবার পরিবেশন করে। রুমি মনোযোগ দিয়ে অন্য টেবিলের কথা শুনতে শুনতে চমকে ওঠে। ছোকরা খাবার আর জলের গেলাস দিয়ে চলে

যায়। রুমি খাবারের দিকে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকায়। নীলোৎপল আসে না। রুমি আবার খাবারের দিকে তাকায়, এবং আবার সিঁড়ির দিকে।

অন্য টেবিল। মেয়েটি : "স্বামী ? স্বামী দেখবে ছেলেমেয়েদের ?"

১ম পুরুষ : "কেন দেখবে না ? তোমার স্বামী যেমন চাকরি করে, তুমিও তেমনি করো। ছেলেমেয়েদের দেখার দায়িত্ব তোমার একলার হবে কেন ? সেও দেখবে।"

২য় পুরুষ : "যাকে বলে কমরেডশিপ। দুজনের সমান দায়িত্ব।"

মেয়েটি : "থাক, তোমাদের পুরুষদের কথা জানা আছে। সব স্বার্থপর। বউ চাকরি করবে, বউ রাঁধবে, বউ ছেলেমেয়ে দেখবে, আর স্বামী বিয়ে করেই মাথা কিনেছে, টাকা ফেলে দিলেই তার দায় শেষ।"

৩য় পুরুষ : "আমি যদি চাকরিওয়ালা বউ বিয়ে করি, কখনো এ রকম করবো না।"

মেয়েটি হেসে : "আগে করো, তারপর দেখা যাবে।"

দৃশ্যান্তরে। রুমির টেবিলে ছোকরা ঠক করে দু' কাপ চা নামায়, বলে, "কী হলো, খাচ্ছেন না ? সব তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

রুমি চমকে ওঠে, সিঁড়ির দিকে উদ্বিগ্ন ব্যস্ত চোখে তাকায়, নীচু স্বরে বলে, "উনি কোথায় গেলেন ?"

ছোকরা : "আপনার সঙ্গে যে ভদ্রলোক—মানে আপনার স্বামী এসেছেন ?"

রুমির মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে তাকায়, কিছু বলে না।

ছোকরা বলে, "উনি তো নীচের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বোধ হয় সিগ্রেট-টিগ্রেট কিনতে গেছেন।" বলে সরে যায় অন্য টেবিলের দিকে।

অন্য টেবিলে একজন, "আমাদের কত হয়েছে ভাই?"

ছোকরা: "পাঁচ টাকা আশী পয়সা।"

মেয়েটি: "আমি দিচ্ছি।"

একজন পুরুষ: "না না, পরশু তুমি খাইয়েছ, আজ মিত্তির দেবে।"

আর একজন পুরুষ: "আচ্ছা আচ্ছা, আমিই আজ দিচ্ছি।" পকেট থেকে ছ'টাকা বের করে দেয়।

সবাই উঠে দাঁড়ায়, রুমির পাশ দিয়ে সবাই নীচে নেমে যায়। ছোকরা খালি ট্রে-তে খালি কাপ ডিস প্লেট তুলে নিয়ে চলে যায় সিঁড়ির দিকে।

রুমি ব্যাকুল উদ্বিগ্ন চোখে ছেলেটার দিকে তাকায়। ছেলেটাও সিঁড়িতে পা দেবার আগে একবার রুমিকে দেখে নেয়। তারপরে নেমে যায়।

রুমিকে যেন ওপরের শূন্য ঘরটা হাঁ করে খেতে আসে। ও হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ির কাছে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, আবার টেবিলের কাছে ফিরে আসে। আর্ত অসহায় ভাবে একবার চেয়ারের পিছনটা আঁকড়ে ধরে, আবার অস্থির ভাবে পিছন ফিরে সিঁড়ির দিকে তাকায়।

ছোকরা উঠে আসে সিঁড়ি দিয়ে, পিছনে পিছনে একজন লোক। রুমি ওপরে ওঠবার সময় লোকটিকে নীচে একটা টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখেছিল। এগিয়ে এসে বলে, "কী হলো? এতক্ষণ খাবারের অর্ডার দিয়েছেন, খাচ্ছেন না কেন?"

রুমি মাথা নত করে থাকে। লোকটি আর ছোকরা চোখাচোখি করে। লোকটি আবার বলে, "আপনার সঙ্গে যে ছিল, সে কোথায় গেল?"

রুমি কোনো রকমে মাথা নাড়ে। লোকটি ঝাঁজিয়ে ওঠে, "জানেন না তো এখানে এসে ঢুকেছেন কেন? নীচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে

রেখে এসেছেন, সেও তাড়া দিচ্ছে। খাবার না খান, পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চলে যান।"

রুমি শক্ত করে চেয়ার আঁকড়ে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে, "আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু নেই।"

লোকটি: "পয়সা নেই তো খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন কেন?"

রুমি: "আমি দিই নি, রতনদা দিয়েছিল, কিন্তু—"

লোকটি: "আর রতনদা বসিয়ে রেখে কেটে পড়েছে! যান, ট্যাক্সিওয়ালার মোকাবিলা করুন নীচে গিয়ে।" ছোকরাকে: "নে, খাবারগুলোতে হাত পড়ে নি, সব তুলে নিয়ে যা।"

রুমি দরদর করে ঘামছে।

লোকটি: "যান যান, বেরিয়ে যান।"

রুমি পা বাড়ায়।

দৃশ্যান্তর। রাস্তা। ট্যাক্সিওয়ালা মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকজন লোক। সে কিছু বলছে। রুমিকে দেখেই হেঁকে ওঠে, "এই যে, এসেছে! পাঁচ দশ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা! দিন, আমার ভাড়া মিটিয়ে দিন।"

রুমি মাথা নত করে, আবার মুখ তোলে, ঠোঁট কাঁপে, বলে, ' আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু নেই।"

ড্রাইভার চিৎকার করে: "ও সব রমজানির কথা আমি শুনতে চাই না। সেই হাওড়া থেকে এই ভবানীপুর এলাকায় বয়ে এনেছি, আর এতক্ষণ ওয়েটিং। মিটার এখনো ডাউন করা।"

রুমি অসহায় অপমানে মুখ তুলতে পারে না। তবু আশেপাশে ব্যাকুল চোখে তাকায়, যদি রতনকে দেখা যায়।

ভিড়ের স্বর ড্রাইভারকে: "সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ নেই?"

ড্রাইভার: "ছিল তো। দুজনে একসঙ্গেই তো ভেতরে খেতে ঢুকেছিল।"

রেস্তোরাঁর ছোকরা হেসে: "ওই ঢোকা পর্যন্তই। তারপরেই সেই ব্যাটাছেলে আমাদের দোকানের পেছুকার দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে। আমি ভাবলাম সিগ্রেট, পান-টান কিনতে যাচ্ছে।"

ভিড়ের স্বর: "ও, কেস্ গড়বড়ে।"

অন্য এক স্বর: "স্বামী না অন্য কেউ?"

ভিন্ন স্বর: "সিঁথেয় সিঁদুর-টিঁদুর তো দেখা যাচ্ছে না।"

আর এক স্বর: "ও বাবা, কাঁটালে পীরিতের আটা।"

অনেকে হেসে ওঠে। ড্রাইভার চিৎকার করে, "আমি ও সব কিছু জানি না। এখনও আমার মিটার ডাউন করা। ভাড়া দিতেই হবে।" বলতে বলতে প্রায় রুমির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে: "কি হলো? ভাড়া বের করো।"

রুমি ঠোঁটে ঠোঁট চাপে, ওর দুই চোখের কোণে জল জমে ওঠে, ধরা গলায় বলে, "বিশ্বাস করুন, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

ড্রাইভার: "নেই তো, ট্যাক্সি চাপার শখ হয়েছিল কেন?"

রুমি সজল চোখে, যন্ত্রণাকাতর মুখে আশেপাশে তাকায়, মাথা নত হয়, আবার মাথা তোলে, বলে, 'বিশ্বাস করুন, আমি ও সব কিছুই জানি না। আমার কোনো শখও হয় নি, শুধু—।" কথা শেষ করতে পারে না, স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

ভিড়ের স্বর: "গায়ে গহনা-টহনা কিছু নেই?"

অন্য স্বর: "আছে, হাতে কাঁচের চুড়ি।"

আবার সবাই হাসে। ভিড়ের স্বর: "দেখে মনে হচ্ছে, কলকাতার বাইরে থেকে আমদানি।"

অন্য স্বর: "লোকটা শালা তালেবর আছে তো। রেস্টুরেন্টে বসিয়ে রেখে হাওয়া?"

* ড্রাইভার: "ও সব ন্যাকামি-ট্যাকামি রাখো। ভাড়া বের করো, তা নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

রুমি অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, কিন্তু একটু যেন স্পষ্ট স্বরে বলে, "ন্যাকামি আমি জানি না। আপনাদের তো বাড়িতে বউ মেয়েরা আছে। আমি সত্যি জেনে শুনে কোনো অন্যায় করি নি।"

ড্রাইভার: "ও সব বাড়ির মেয়ে বউদের কথা ছাড়ো। আমি তা হলে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবো।"

রুমি এই অপমানের দুর্দশার মধ্যেও, সজল চোখে যেন একটু হাসে, বলে, "আপনার যদি তাই ভালো মনে হয়, তো নিয়ে চলুন। শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে। আমি যখন একজনকে বিশ্বাস করে এইভাবে ঘর ছেড়ে চলে এসেছি।" কথা থেমে যায়, স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ জলে ভরে ওঠে। ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলে, "শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে। আমার আর কোনো অন্যায় নেই। কোথায় নিয়ে যেতে চান, চলুন।"···

ড্রাইভার যেন কিছুটা অপ্রস্তুত, যদিও চোখে ক্রোধের দীপ্তি, সে জনতার মুখের দিকে তাকায়। জনতার মধ্যেও একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

রুমি হঠাৎ দু' হাত বুকের কাছে জড়ো করে, চোখ বোজে, বলে, "কিন্তু আমি মিথ্যে বলি নি।" ক্যামেরা ওর ক্লোজে, পর্দায় কেবল ওর যন্ত্রণাকাতর মুখ। চকিতে অন্ধকার নেমে আসে পর্দায়, তারপরেই হলে আলো জ্বলে ওঠে।

"সুপার্ব!" মাথুরজী প্রথমেই বলে ওঠেন।

অন্যান্য দর্শকের মধ্যে তখনো আচ্ছন্নতা। অথচ এখানে কেউই সাধারণ দর্শক না। অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, এডিটর, সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট এবং অন্যান্য কলাকুশলী উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু রুমির সত্যনিষ্ঠ বাস্তব অভিনয়, পরিচালকের পরিবেশ সৃষ্টি, ক্যামেরাম্যানের জাদুকরী সব ফ্রেমের খেলা, রুপোলী পর্দার ঘটনা যেন সবাইকেই একটি মেয়ের অসহায় অবস্থায় বিচলিত করে তুলেছে। সকলেই যেন হতভাগী মায়ার জীবনের সংকটে জড়িয়ে পড়েছে।

উজ্জ্বলকুমার উঠে এসে, রুমির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "পারফেক্টলি ডান।"

রুমি উজ্জ্বলের হাত স্পর্শ করলো। যদিও ও যেন মনে মনে এখনো সেই নিষ্ঠুর পরিবেশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনো ওর মুখে একটা অসহায়তার ছাপ, তথাপি হেসে বললো, "থ্যাংক্যু। কিন্তু এর পরেই তোমার এ্যাপিয়ারেন্স, তখন হয় তো আমাকে সবাই ভুলে যাবে।"

"শত হলেও তোমার আবির্ভাব তো মায়ার ত্রাতা হিসাবে।" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, উজ্জ্বলকে। রুমির দিকে ফিরে বললেন, "কিন্তু তোমার কাজের তুলনা নেই।" তিনি সান্যাল এবং অন্যান্যদের দিকে ফিরে বললেন, "সকলের কাজই খুব ভালো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গণদেবতার কী মর্জি, কে জানে?"

রুমি উঠে দাঁড়ালো, বললো, "যার যা ভাবনা। মিঃ গাঙ্গুলি বক্স অফিসের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন।"

'ডোণ্ট ওরি মিঃ গাঙ্গুলি।" মাথুরজীও উঠে দাঁড়ালেন, "বী রেস্ট এ্যাশিওর, ইট ইজ গোয়িং টু বী এ হিট প্রোডাকশান।"

ইতিমধ্যে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সামনের সারির আসনের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। কেউ কেউ হলের বাইরেও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সান্যাল বললেন, "আমাদের এবার বেরনো দরকার।"

রুমি আশেপাশে অনেকের মুখের দিকেই অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে দেখছিল। ওর বাঁদিকে মিঃ গাঙ্গুলির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলো, "মিঃ গাঙ্গুলি, অবনীশকে আজ প্রোজেকশান দেখতে আসতে বলেন নি?"

"বলি নি মানে? আমি নিজে তাকে সঙ্গে করে এনেছি।" মিঃ গাঙ্গুলি রীতিমতো স্বর চড়িয়ে বললেন, "রুমি সেনের হুকুম আমি কখনো তামিল না করে পারি?" বলে তিনি মুখ তুলে সকলের দিকে দেখতে লাগলেন।

রুমি হেসে বললো, "হুকুম বলবেন না মিঃ গাঙ্গুলি—" বলে ও নিজেও আশেপাশে চোখ তুলে দেখলো।

মিঃ গাঙ্গুলি অবাক অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ছোকরা কি আমাকে না বলে চলে গেল নাকি?" বলে তিনি দরজার দিকে দেখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, "আরে, তুমি ওখানে সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছো? আর আমরা তোমাকে খুঁজে মরছি!"

রুমি পিছনে তাকিয়ে দেখলো, অবনীশ সকলের পিছনে, ওর সুদীর্ঘ চেহারাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপ্রস্তুত লজ্জার হাসি, চোখ রুমির দিকে। এগিয়ে আসতে আসতে বললো, "দাঁড়িয়ে আছি মানে, —আপনাদের পেছনে পেছনেই বেরবো ভাবছিলাম।"

রুমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, "পেছনে পেছনে কেন?" কিন্তু ও লক্ষ্য করলো, সকলের কৌতূহলিত দৃষ্টি ওর আর অবনীশের দিকে। অবনীশের অবাক মুগ্ধ চোখের দৃষ্টির মর্ম বুঝতে অসুবিধা হলো না। সকলের সব প্রশংসাকে ছাপিয়ে, অবনীশের মুগ্ধ দৃষ্টি কি ওর শিল্পী-মনকে বিশেষ খুশিতে ঝলকিয়ে তুললো? অস্বাভাবিক কিছু না। এখানে সকলেই প্রায় প্রফেশানের সঙ্গে যুক্ত লোক। এঁদের প্রশংসা ও জীবনে অনেক পেয়েছে। ওর ভক্ত, মুগ্ধ দর্শকের সঙ্গেও অবনীশকে মিলিয়ে ফেলতে পারছে না। কারণ, অবনীশ ওর পুনর্জন্মের আগে, অতীত জীবনের একমাত্র সাক্ষী আর সূত্র, এই পরিবেশের মধ্যে। সেই জন্যই অবনীশের মুগ্ধতা অনন্য, যার মধ্যে ওর শিল্পীমন অনুভব করছে এক নতুনত্বের স্বাদ।

"লেট আস প্রসিড টু দ্য ডোর, মিস সেন।" মাথুরজী যেন রুমিকে খানিকটা আগলাবার ভঙ্গি করে, দরজার দিকে হাত বাড়ালেন।

রুমি অবনীশের দিকে তাকিয়ে, ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে, আমন্ত্রণের সংকেত জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে এসে ভিড়

অনেক হালকা হয়ে গেল। রুমির চারপাশে মাথুরজী, মিঃ গাঙ্গুলি, সান্যাল, মিঃ ও মিসেস দেওড়া এবং আরো দু-একজন।

রুমি দেখছিল অবনীশের দিকে। বেরিয়ে আসতেই, রুমি হাত তুলে ওকে ইশারা করলো, এবং বিশেষ কারোকে উদ্দেশ্য না করে, সকলের ব্যূহ ভেদ করে সরে যেতে যেতে বললো, "এক্সকিউজ মী, এক মিনিট, আসছি।" ও এগিয়ে গেল অবনীশের দিকে, ডাকলো, "শোনো।"

অবনীশ রুমির কাছে এগিয়ে এলো। রুমি জানতো, সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ও গলার স্বর নামিয়ে, অবনীশকে জিজ্ঞেস করলো, "কী ব্যাপার, সেই বার্থ-ডে পার্টির পরে আর কোনো যোগাযোগ করলে না তো?"

অবনীশ অপ্রস্তুত লজ্জায় হাসলো, বললো, "করবো ভেবেও, করা হয়ে ওঠে নি।"

"খুব ব্যস্ত ছিলে বুঝি?" রুমি অবনীশের চোখের দিকে তাকালো।

অবনীশ মাথা নেড়ে হেসে বললো, "আদৌ না। সেদিন গাঙ্গুলির মুখেই তো শুনলে, আমি এক রকম বেকার।"

"সেটা তো তোমার জেদের জন্য।" রুমি হেসে বললো, "তা হলে যোগাযোগ করলে না কেন বলো তো? আমার ঠিকানা তো—।"

অবনীশ বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "রুমি সেনের ঠিকানা আবার খুঁজতে হয় নাকি? এমন কি গাঙ্গুলিদা তোমার বাড়ির একটা আলাদা টেলিফোন নাম্বারও আমাকে দিয়ে রেখেছেন, যে নাম্বার ডাইরেক্টরিতে নেই, ডায়াল করলে সরাসরি তোমাকে পাওয়া যায়, তোমার সেক্রেটারিকেও দরকার হয় না।"

"আমি আমার সেক্রেটারি মিস দাসকেও তোমার কথা বলে রেখেছিলাম।" রুমি বললো, "তুমি ফোনও তো করতে পারতে। তারই বা দরকার কি, তুমি সোজা চলেই এলে না কেন?"

অবনীশের মুখে আবার অপ্রস্তুত হাসি ফুটলো, বললো, "সবই পারতাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি রমা, কিছুতেই যেন ভেতরের সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না।"

"স্ট্রেঞ্জ !" রুমি বাঁ হাতের একটি ভঙ্গি করে বললো, "আমি নিজেই তো তোমাকে আসতে বলেছি। তোমার আবার সংকোচ কিসের ?"

অবনীশ বললো, "রুমি সেন, তুমি যতোটা সহজে কথাটা বলছো, আমি যে ততো সহজে নিতে পারি না। অতীতটা যে অতীতই, আর তুমি হলে আজকের রুমি সেন। তুমি অনায়াসে ডাকতে পারো, সাড়া যে দেবো, তেমন সাহস কোথায় ?"

"হ্যাঁ, আমি রুমি সেন।" রুমি বললো, একটু যেন বিষণ্ণ অন্যমনস্কতায়, "কিন্তু আমাকে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই। অতীত—অতীতই, তবু অতীত না থাকলে বর্তমানের অস্তিত্বটা যে মিথ্যে হয়ে যায়। আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমার সাহস হয় নি, এটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

অবনীশ ব্যস্ত ভাবে হেসে বললো, "আরে তুমি গম্ভীর হচ্ছো কেন ? আমার সত্যি যা মনে হয়েছে, তাই বললাম। তবে কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আর সাহসের অভাব হবে না।"

"সত্যি ?" রুমি হাসলো, হাসি ঝিলিক দিল ওর চোখে, যেন একটা রহস্যের দ্যুতিতে। বললো, "সব থেকে ভালো, তোমার সাহসটা আমিই যুগিয়ে দিই। আজ এখুনি। চলো, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।"

অবনীশ যেন ব্যস্ত হয়ে বলল, "আহা, এত ব্যস্ততা কিসের ?"

রুমি চলতে উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, "এটা ব্যস্ততা নয়, আমার একটা আকাংখা। আমি জানি, তোমাকে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠলেই, এখানে নানা রকম গুঞ্জন শুরু হয়ে যাবে। তা যাক। তুমি যাবে না ?"

অবনীশ হেসে বললো, "এটাও তো একটা ভয়ের ব্যাপার, আমার না বলার সাহস কোথায় ?"

রুমি হেসে উঠলো। বললো, "এসো।"

অবনীশ রুমিকে অনুসরণ করলো। তখনো মাথুরজী, মিঃ গাঙ্গুলি, মিঃ সান্যাল, তাঁর ফার্স্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রলয়সহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। রুমি সকলের কাছে বিদায় চাইল, "আমি তা হলে এখন চলি।"

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আমরাও তো তোমার সঙ্গেই যাবো। তুমি এখন বাড়ি যাবে তো ?"

রুমির মুখে ঝটিতি একটি অসত্য কথা এসে গেল, বললো, "না, আমি এখন বাড়ি যাবো না, একটু সুধাময়ী দেবীর বাড়ি যাবো। ওঁকে কি আজকের প্রোজেকশান দেখতে আসতে বলা হয় নি ?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে !" মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, "আমি নিজে সুধাময়ী দেবীকে টেলিফোন করে আসতে অনুরোধ করেছি, আসবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। কেন এলেন না, তা বুঝতে পারলাম না।"

রুমি ইতিমধ্যে হাত তুলে ড্রাইভারকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে আসতে ইশারা করেছিল। মিঃ গাঙ্গুলির কথা শুনে, এখন ওর অসত্য কথার মধ্যে যেন একটা যুক্তি খুঁজে পেল, বললো, "বুঝতে পারছি না, শরীর-টরীর খারাপ হলো কী না, একবার ঘুরে আসি।" তারপর মিঃ সান্যালের দিকে ফিরে বললো, "আপনি কি কিছু বলছিলেন ?"

মিঃ সান্যাল বললেন, "ভেবেছিলাম, আজ এখন আপনার বাড়ি গিয়ে, স্ক্রিপ্টটা নিয়ে একটু ডিস্‌কাস্‌ করবো। তা আপনি তো এখন আদারওয়াইজ বিজি হয়ে পড়লেন।"

"কাল সকাল দশটার পরে আসুন।" রুমি বললো, "কাল তো শুটিং নেই।"

মিঃ সান্যাল বললেন, "আপনার অসুবিধে না হলে, তাই যাবো।"

রুমির গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার তেজসিং নেমে পিছনের দরজা খুলে ধরলো। রুমি সকলের কাছ থেকে আলাদা

আলাদা বিদায় নিল, "গুডনাইট মিঃ মাথুর। চলি মিঃ গাঙ্গুলি। মিঃ সান্যাল, প্রলয়বাবু, চলি।" বলে ও অবনীশের দিকে ফিরে ডাকলো, "এসো।"

অবনীশের চোখে মুখে অস্বস্তি। গাড়ির কাছে এগিয়ে বললো, "তুমি ওঠো আগে।"

রুমি গাড়ির ভিতরে ঢুকে এক পাশে বসলো। অবনীশও ঢুকে বসলো এক পাশে। তেজসিং দরজা বন্ধ করে দিয়ে, নিজের আসনে বসে, গাড়ি চালিয়ে দিল। গাড়ি স্টুডিও এলাকা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই, অবনীশ জিজ্ঞেস করলো, "সুধাময়ী দেবী তো একজন অভিনেত্রী। তুমি কি এখন সেখানে যাবে নাকি?"

"যেতে যে একেবারে ইচ্ছে করছে না, তা বলবো না।" রুমি বললো, "মার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

অবনীশ অবাক স্বরে উচ্চারণ করলো, "মা?"

"হ্যাঁ, মা।" রুমি অন্যমনস্ক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে বললো, "নিজের মাকে তো মনেই পড়ে না। সুধাময়ী দেবীকে আমি মা বলে ডাকি, কারণ তাঁকে আর কিছু বলে ডাকা যায় বলে আমার মনে হয় না। এই জগতে তিনিই আমার মা।"

অবনীশ রুমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না। রুমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ একটু হেসে, অবনীশের দিকে ফিরে বললো, "ভয় নেই, তোমাকে এখন আমি সেখানে টেনে নিয়ে যাবো না।"

অবনীশ বললো, "ভয় আমি পাচ্ছি না। তুমি যদি যেতে চাও চলো। তবে আমার সঙ্গে তো তাঁর কখনো পরিচয় হয় নি, হঠাৎ যাবো, তাই—।"

"না না, আজ যেতে হবে না।" রুমি বললো, "আমি স্টুডিওতে ওঁদের সামনে ইচ্ছে করেই কথাটা বলেছি, তা নইলে ওঁরা এখন আমার বাড়িতে আসতেন। শুনলে না, ডিরেক্টার এখনই আমার

সঙ্গে স্ক্রিপ্ট্ নিয়ে ডিসকাস করতে চাইছিলেন। হয়তো তাই করতাম, কিন্তু তোমাকে পেয়ে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করার ইচ্ছে হলো।"

অবনীশ যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠলো, "ওহ্ রমা, আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি।"

রুমি জিজ্ঞাসু চোখে অবনীশের দিকে তাকালো। চলন্ত গাড়িতে রাস্তার আলো মাঝে মাঝে ওদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। অবনীশ বললো, "ঠিক কি ভাবে বললে মনের কথাটা বোঝানো যায়, বুঝতে পারছি না। এক কথায়, আমি আজ অভিভূত হয়ে গেছি।"

এই আচমকা প্রসঙ্গে, রুমি সহসা অবনীশের বক্তব্য বুঝে উঠতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ ব্যাপারে বলো তো?"

"কোন্ ব্যাপারে আবার? তোমার অভিনয়ের কথা বলছি।" অবনীশ অবাক মুগ্ধ স্বরে বললো।

রুমি হাসলো, বললো, "ওহ্, তাই বলো।"

অবনীশ বললো, "তোমার কাছে ব্যাপারটা হয়তো সামান্য, কিন্তু আমার কাছে অসামান্য। আশ্চর্য তোমার এ্যাকটিং, এক্সপ্রেশান, মুভমেন্টস্! জাতশিল্পী কাকে বলে, কথাটা আমি আজ প্রথম অনুভব করলাম। রমা, ইউ আর এ জীনিয়াস! সত্যিকারের প্রতিভাময়ী।"

রুমির চোখে মুখে খুশির অভিব্যক্তি, কিন্তু সলজ্জ হেসে বললো, "অবনীশ, এ সব শুনে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু তোমার মুখ থেকে শুনে লজ্জা পাচ্ছি।"

"তুমি লজ্জা পাচ্ছো, কিন্তু আমি গৌরব বোধ করছি।" অবনীশের স্বরে আবেগ, বললো, "রমা, তোমাকে পর্দায় দেখতে দেখতে কেবলই আমার সেই আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, আর ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, এই কি আমাদের সেই রমা? তোমার রূপ আছে, অনেক মেয়েরই থাকে। কিন্তু তোমার মধ্যে যে এমন প্রতিভা লুকিয়েছিল, তা তো কই, আগে কখনো বুঝতে পারি নি?"

রুমি যেন কিছুটা আচ্ছন্ন আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বললো, "আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, তাই নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি।"

"না না, তা হয় না রমা।" অবনীশ জোরে ঘাড় নেড়ে বললো, "যে সুযোগ পায় তাকেই যে প্রতিভা স্পর্শ করে, আমি তা বিশ্বাস করি না। তুমি নিজে আমার থেকে ভালো জানো, তোমাদের জগতে তিলোত্তমা অপ্সরীরা তো কতো সুযোগ পায় আর তারা রূপ দেখিয়ে ছু'দিনের মধ্যেই কোথায় হারিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ তাদের মনে রাখে না। কারণ মনে রাখার মতো তাদের কোনো কীর্তি নেই।"

রুমি হেসে বললো, "তুমি বায়াস্—আমার সম্পর্কে।"

"আদৌ না।" অবনীশ বললো, "আমি যে খুব একটা ছবি দেখে বেড়াই, বা অভিনয় সম্পর্কে একজন বোদ্ধা ব্যক্তি, তা মোটেই নয়। কিন্তু আমার কিছু কমন-সেন্স আছে, আমি তোমার পারফরমেন্স দেখতে দেখতে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, ভাবছিলাম, ছবির মেয়েটির দুর্দশা অপমান আমাকে পর্যন্ত অসহায় করে তুলছে। সেটা হয় তো সকলেরই হচ্ছিল, আমি অবাক হচ্ছিলাম, অতীতের তোমার কথা ভেবে। তুমি আমাদের সেই রমা, বীরেন সেনের ভাইঝি, কাকা কাকীর ঘাড়ের বোঝা সেই মেয়েটি—।" অবনীশ হঠাৎ থেমে, রুমির মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু তাকালো, কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞাস করলো, "কিছু মনে করছো না তো রমা?"

রমা অন্যমনস্ক আচ্ছন্নতা থেকে চমকিয়ে উঠে, মাথা নেড়ে বললো, "না অবনীশ। কিন্তু তোমার কথা শুনে, আমি যেন সেই আগের দিনগুলোতে চলে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে করছে, কোথাও নিরিবিলি খোলা আকাশের নীচে বসে তোমার সঙ্গে পুরণো দিনগুলোর কথা বলাবলি করি।"

"বেশ তো, চলো না, গঙ্গার ধারে বা লেকের ধারে, কোথাও যাওয়া যাক।" অবনীশ বললো।

রুমি বললো, "লেকের ধারটা বড় কাছে। কলকাতার গঙ্গার ধারেও যা ভিড়, আমি সেখানে—।"

"ক্রাউডেড হয়ে পড়বে।" অবনীশ বললো, "ভুলে যাচ্ছি, যে তুমি হলে রুমি সেন। আমাদের মতো যত্রতত্র স্বাধীন ভাবে তোমার বেড়াবার উপায় নেই।"

রুমি ডান হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখে বললো, "রাত্রি মাত্র সাড়ে আটটা। সব থেকে ভালো হতো, যদি বজবজ বা ডায়মণ্ড-হারবারের দিকে চলে যেতে পারতাম। মাথায় একটা ঘোমটা তুলে দিলেই হবে। কিন্তু—।" ও থেমে গেল, তাকালো অবনীশের দিকে।

অবনীশ জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু—?"

রুমি আঙুলের ইশারায় তেজসিংকে দেখিয়ে বললো, "এ ক্ষেত্রে আর কেউ না থাকলেই ভালো হতো। কিন্তু আমি এতটা দূরের রাস্তা রাত্রিবেলা ড্রাইভ করতে চাই না।"

"এটা কোনো সমস্যা নয়।" অবনীশ বললো, "তোমার ইচ্ছে আর অনুমতি হলে, ও-কাজটা আমিও পারি।"

রুমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ড্রাইভিং জানো?"

"লাইসেন্সও আছে।" অবনীশ বললো, "নেই শুধু রথ। এক সময়ে মেন্‌টেন্‌ করতে পারতাম, এখন আর পারি না।"

রুমি এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো, তারপরে তেজসিংকে ডেকে বললো, "তেজসিং, গাড়িটা দাঁড় করাও।"

তেজসিং আদেশ মাত্র একবার পিছনে রুমিকে দেখে বললো, "জী আচ্ছা।" বলে রাস্তার ধারে লাইট পোস্টের নীচে গাড়ি দাঁড় করালো।

রুমি অবনীশের দিকে তাকিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলে নামলো। অবনীশও নামলো। রুমি চারদিকে একবার দেখে, দ্রুত ওর হাতের ব্যাগ থেকে একটি নোট বের করে বললো, "তেজসিং,

তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি অন্য এক জায়গায় যাবো। এই সাহেব গাড়ি চালাবেন।"

তেজসিং যেন কিছুটা অবাক হলো, তাকালো একবার অবনীশের দিকে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে রুমির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বললো, "জী আচ্ছা।"

অবনীশ চালকের আসনে উঠে বসলো। অন্য দরজা খুলে পাশে বসলো রুমি। অবনীশ বললো, "বললাম তো চালাতে পারবো, কিন্তু তোমার এই বিদেশী বাহনকে কতোটা কব্জা করতে পারবো, কে জানে।" বলতে বলতেই সে গাড়িতে স্টার্ট দিল। হেডলাইট ইণ্ডিকেটার সবই একবার জ্বালিয়ে দেখে নিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চললো অন্য পথে।

রুমি বললো, "ভালোই তো পারছো দেখছি।"

"শেষ রক্ষা করতে পারলে হয়।" অবনীশ বললো. "কোনো রকমে একটু এদিক ওদিক হলে, সারা দেশের লোক আমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। রুমি সেন বলে কথা!" বলে রুমির দিকে তাকালো।

রুমিও তাকিয়ে হেসে বললো, "আমার মূল্য জানা আছে, তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

গাড়ি দ্রুত বেগে আলিপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। অবনীশ বললো, "আমার মনে হয় না, তোমার মূল্য তুমি জানো। তোমার মূল্য বিচার করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আসলে, এ ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই যেন অবিশ্বাস্য লাগছে।"

রুমি জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ ব্যাপারটা?"

রুমি সেনকে পাশে নিয়ে, তার গাড়ি চালিয়ে চলেছে অবনীশ চ্যাটার্জি, আনরিকগ্‌নাইজ্‌ড মডার্ণ আর্কিওলজিস্ট!" অবনীশের স্বরে প্রকৃত বিস্ময়, বললো, "সত্যি, লাইফ ইটসেলফ্ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান।"

রুমি বললো, "অথচ লোকে বলে, গল্পের গরু নাকি গাছে ওঠে।"

"যা বলেছো।" অবনীশ হেসে উঠলো, "গাছে গরু চড়াবার মতো লেখকেরও অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু একটা কথা বলো তো রমা।"

রুমি অবনীশের দিকে তাকালো। অবনীশ একবার ওকে দেখে, আবার সামনে তাকিয়ে বললো, "আমার সঙ্গে তো তোমার সেই কবে থেকে ছাড়াছাড়ি, দেখা সাক্ষাৎ নেই একটা যুগ। তবু কোন্ ভরসায় তুমি আমার সঙ্গে একলা এই রাত্রে চলেছো?"

রুমি বললো, "ভরসা?" বলে এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপর হেসে বললো, "আমার জীবনে ভরসাটা কোথায়, তা আমিও ঠিক জানি না। ওই যে প্রোজেকশানে ছবিটা দেখে এলে, সেই পথে-দাঁড়ানো অসহায় মেয়েটি, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি আজও সেই রকম পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি।"

"রমা!" অবনীশ ডেকে উঠেই, সশব্দে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল, "তুমি রুমি সেন, এ সব কী বলছো?"

রুমি খিলখিল করে হেসে উঠে, হাত তুলে আস্তে একটি চাটি মারলো অবনীশের কাঁধে, বললো, "তা বলে তুমি এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেললে কেন? আমি ভাবলাম বুঝি গাড়ির সামনে কেউ এসে পড়েছে!"

"তার চেয়ে তোমার কথাটা আরো মারাত্মক!" অবনীশ বললো, "তোমার এ কথার মানে কী? তুমি আজো দাঁড়িয়ে আছো পথের ধারে?"

রুমি আবার হেসে উঠে বললো, "কী রকম দাঁড়িয়ে আছি, তোমাকে আমি পরে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবো, তুমি এখন গাড়ি চালাও তো।"

অবনীশ কিছু না বলে, কিছুটা হতভম্ব মুখেই গাড়ি চালালো, আর বারে বারেই মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো রুমির দিকে।

অবনীশের অবস্থা দেখে, রুমির হাসি অদম্য আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, বললো, "আমি ঠিক সেই মেয়েটার মতোই পথের ধারে দাঁড়িয়ে নেই, কিছু তফাত আছে, কারণ আমি হাজার হলেও রুমি সেন, হলো তো? এবার তুমি সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাও, তা নইলে সত্যি সত্যি একটা এ্যাকসিডেন্ট করে বসবে।"

অবনীশ একটু নড়েচড়ে বসলো, সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি যতোই দক্ষিণে অগ্রসর হতে লাগলো, রাস্তা ততোই ফাঁকা হয়ে এলো। কেবল মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই হেভি ট্রাকের হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো রুমি আর অবনীশকে ঝলকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

রুমি সামনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অবনীশের দিকে তাকালো। ওর চোখে অন্যমনস্কতা। অবনীশও একবার তাকালো, আবার সামনের দিকে চোখ রেখে বললো, "কিছু বলবে?"

রুমি বললো, "না। একটা কথা মনে পড়ছে।"

"কী বলো তো?" অবনীশ জিজ্ঞেস করলো।

রুমি বললো, "তোমার সেই চলে যাবার দিনটা মনে পড়ছে।"

"আমার চলে যাবার দিন?" অবনীশের স্বরে অবাক কৌতূহল, "কোন্ চলে যাওয়া, কবে, কোথায়?"

রুমি ঈষৎ হেসে বললো, "কোথায় সেটা জানি না, বোধ হয় বম্বে। তা আজ থেকে নিশ্চয় বারো বছর আগের কথা। সেই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তুমি তখন এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বেরিয়েছো। আমার বয়স তখন—।"

"আঠারোর বেশি হবে না।" অবনীশ বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "বড় জোর উনিশ হতে পারে। বুঝেছি, কোন্ দিনটার কথা তুমি বলছো। আমি বম্বে থেকে একটা চাকরির এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে চলে গেছলাম।"

রুমি বললো, "অবিশ্যি তুমি আমাকে তেমন করে কিছু বলো নি। আমার খুড়তুতো ভাই এসে যখন বললে তুমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছো, আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেছলাম।"

"আসলে, তোমাকে বলবার কোনো অবকাশই তখনো পাই নি।" অবনীশ যেন কিছুটা বিব্রত ভাবে বললো, "তবে যাবার আগে, তোমাকে নিশ্চয়ই জানিয়ে যেতাম।"

রুমি একটু হাসলো, "সেটা আজ আর প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। আমি সামান্য একটা মেয়ে, কাকা কাকীর ঘাড়ের বোঝা, ভেসে যাওয়া শ্যাওলা যেন ঠেকেছিল একটা চড়ায়—।"

"রমা!" অবনীশ যেন আহত স্বরে ডেকে উঠলো।

রুমি বললো, "তোমাকে দোষ দিয়ে কিছু বলছি না অবনীশ। আমি জানতাম, আমার শ্যাওলার মতো জীবনটার প্রতি তোমার অনেকখানি সমবেদনা ছিল। হয় তো সেই দুর্ভাগা মেয়েটার জন্য তোমার মনে স্নেহ ছিল—।"

"হয় তো বোলো না রমা।" অবনীশ বাধা দিয়ে বললো, "তোমার ওপর অবিচারটা বড়ো বেশি চোখে পড়তো। তোমার কাকা কাকীমা তাঁদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তোমাকে অনেক তফাত করে দেখতেন, অবহেলা করতেন। চোখের সামনে দেখেও কিছু বলতে পারতাম না। পাশের বাড়ি হলেও পরের বাড়ির মেয়ে তো বটে। আমি বেশি সিমপ্যাথি দেখাতে গেলে, তার মানেটা হয়ে যেতো উলটো, তাই না?"

রুমি বললো, "সংসারের নিয়মটাই বোধ হয় তাই। কিন্তু সেই অবিচারের কথা থাক অবনীশ।" ও একটা উদগত দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার বললো, "যা পাওয়া যায় না, মানুষের আকর্ষণটা সেদিকেই বেশি। তোমার সমবেদনা, তোমার স্নেহ, আমার সেই জীবনের একটা মস্ত বড়ো বল ছিল। মনের বল, তোমাকে বা কারোকেই সে-কথা কখনো মুখ ফুটে বলতে পারি নি। তারপরে হঠাৎ যখন শুনলাম,

তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছো, মনে হয়েছিল, আমার কী যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। শুনেই তাড়াতাড়ি ছুটে গেছলাম। গিয়ে দেখলাম, তোমার যাত্রার আয়োজন হচ্ছে। সেইদিন রাত্রেই তুমি চলে গেছলে।"

"অস্বীকার করবো না রমা, হয় তো তোমার মনের অবস্থা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।" অবনীশ বললো, "কিন্তু সকালে যখন তুমি আমাদের বাড়ি এসেছিলে, তখন তোমাকে আমি কী বলেছিলাম, সে-কথা আমার এখনো মনে আছে।"

রুমি বললো, "আমারও আছে।" ও একটু হাসলো, বললো, "তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলে, 'রমা আমি চলে যাচ্ছি। কবে ফিরবো, কোনো ঠিক নেই। আবার যখন আসবো, তখন হয় তো তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, আর দেখা হবে না।' তুমি বুঝতে পারো নি, আমার ভেতরটা তখন যেন মুচড়ে উঠছিল। কথা বলতে পারছিলাম না, পাছে কান্না পেয়ে যায়।"

"কিন্তু আমার মনে আছে, তুমি হেসে বলেছিলে, 'আমার বিয়ে?'" অবনীশ বললো, "যেন কতোই আশ্চর্যের কথা। অবিশ্যি তুমি ঠিকই বলেছিলে। তোমার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'তোমার ভাগ্যে কী আছে জানি না, তবে চিরদিন তোমার এ জীবন থাকবে না। জীবনে পরিবর্তন আছেই। তোমার কোনো সদ্গতি হলে আমি সব থেকে বেশি সুখী হবো, আর সেটাই আমি কামনা করি, এত অবিচার অবহেলা থেকে মুক্তি পেয়ে, তোমার জীবনটা যেন সুখী আর সুন্দর হয়ে ওঠে।' মনে আছে তো রমা?"

রুমির দৃষ্টি করুণ, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, বললো, "মনে নেই? আমি তেমন অকৃতজ্ঞ নই। তোমার প্রতিটি কথাই আমার স্পষ্ট মনে আছে। তোমাকে আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি, কারণ তখন গলার কাছে আমার কান্না ঠেলে আসছিল। কিছু না বলে আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম। তুমি চমকে আমাকে

হাত ধরে টেনে তুলেছিলে। খুব অবাক হয়ে গেছলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলে। আমি কান্না চাপবার জন্যই হেসেছিলাম, আর তোমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছলাম।” কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখ যেন ছলছলিয়ে উঠলো।

অবনীশের চোখে মুখে আবেগ ফুটে উঠলো। দূরে নক্ষত্রের আলোয় চিকচিক করছে নদীর জলের রেখা। আপনা থেকেই যেন গাড়ির গতি কমে এলো। রুমির দিকে ফিরে ডাকলো, “রমা!”

রুমি ওর বুক মোচড়ানো আবেগকে সংযত করতে চাইছে, তবু যেন পারছে না। সীটের ওপর পড়ে থাকা ওর হাতটা অবনীশ দেখলো। স্টীয়ারিং থেকে হাত নামিয়ে রুমির হাত স্পর্শ করে আবার ডাকলো, “রমা।”

রুমি কোনো জবাব দিল না, অবনীশের চওড়া মোটা মোটা আঙুলের হাতটা ওর দীর্ঘ রঞ্জিত নখ মসৃণ আঙুলগুলো দিয়ে নিজের হাতে তুলে নিল। বাইরে নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশ আর মোহনা চোখের সামনে অনন্তের রূপ নিয়ে দেখা দিল।

অবনীশ বললো, “রমা, যদি বলি তোমাকে সেই সময়ে আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম তা হলে মিথ্যে বলা হবে। তুমি আমাকে সেই ভাবে কিছু বুঝতেও দাও নি।”

রুমি বললো, “সেই ভাবে আর এই ভাবে বোঝাবার মতো কিছু ছিল না। আমি কাকার বাড়িতে মানুষ হওয়া একটা মেয়ে—আমার দুঃখে তুমি দুঃখ পেতে, মনে মনে স্নেহ করতে, আমার মঙ্গল কামনা করতে, সেটাই আমার অনেকখানি ছিল। সেটুকুর জন্যেও আমার কেউ ছিল না।”

“সত্যি, আজ আর সেই দিনগুলোয় আকাশ পাতাল তফাত।” অবনীশ বললো, “মনে পড়ে, তখন সবে এঞ্জিনিয়ারীং-এ ভর্তি হয়েছি আমি, কী কারণে যেন তোমাদের বাড়ি গেছিলাম। তখন তোমার বয়স আরো কিছু কম, বোধ হয় চৌদ্দ পনেরো হতে পারে। তোমার

খুড়তুতো ভাই বোনেরা খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে। আর তুমি ভেতরের উঠোনের তারে, সদ্য কাচা জামা মেলে দিচ্ছিলে। হঠাৎ একটা কাপড় উঠোনের মাটিতে পড়ে গেল, আর তোমার কাকীমা…।"

অবনীশ কথা শেষ করতে পারলো না, যেন গলায় আটকিয়ে গেল। রুমি যেন বর্তমানে নেই। দুজনেই অতীতের ভাবনায় স্তব্ধ প্রস্তর মূর্তির মতো, আকাশ আর নদীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

রুমির চোখের সামনে ভেসে উঠলো অবনীশের বিবৃত সেই ছবি। ওর গাছকোমর বাঁধা শাড়ি, জায়গায় জায়গায় ভেজা, খালি গা। মাথার চুল টান টান করে ঘাড়ের কাছে পাকিয়ে জড়ানো। কলতলা থেকে বালতি বোঝাই জামা কাপড় কেচে নিংড়ে নিয়ে এসে, কাকীমার একটা শাড়ি পাকিয়ে তারের দিকে ছুড়ে দিল। শাড়িটা তার অবধি পৌঁছুলো না, উঠোনের মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

কাকীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন রান্নাঘরের পাকা দাওয়ায়। তৎক্ষণাৎ রূঢ় স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "কি করলি হতভাগা মেয়ে? কাপড়টা কি দশ মন ভারি, যে তারে ছুড়ে দিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়? নাকি খেতে পাস না, গায়ে গতরে শক্তি নেই?"

রুমি সচকিত ভয়ে একবার কাকীমার দিকে দেখলো। ওরই সমবয়সী বোন কবিতা, ফ্রক পরা, ইস্কুলের বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে, বিপরীত দিকের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো "রমা, তুই এখন থেকে রোজ টেংরির ঝোল খাস, তাহলে গতরে শক্তি হবে।" বলে মায়ের দিকে ফিরে বললো,

"মা, আমাদের যে মাঝে মাঝে টেংরির ঝোল দাও রমাকেও সে রকম দাও না কেন?"

কাকীমা তাঁর কন্যাকে ধমকে বললেন, "থাক, তোমাকে আর ফুট কাটতে হবে না। সপ্তাহে দু'দিন এক টাকা দিয়ে দুটো টেংরি আনতে তোমার বাপের চিত্তির উলটে যায়, তার থেকে আবার রমাকে খাওয়াতে হবে?"

ইতিমধ্যে রমার চোখ পড়েছিল, বাড়ির ভিতর বারান্দা আর দরজার মাঝখানে অবনীশ দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা চোখ ঘুরিয়ে হেসে বললো, "আর কতক্ষণ কয়লা পুড়িয়ে টেংরির ঝোল করতে হয়, সেটা বললে না?"

কাকীমা ধমকে উঠলেন, "ফের? এখন ইস্কুলে যাবার দেরি হচ্ছে না, না?"

কবিতা হাসতে হাসতে দরজার দিকে যেতে অবনীশের মুখোমুখি হলো, বললো, "এহ্, তুমি?"

অবনীশ কবিতার পথ ছেড়ে দিয়ে বললো, "তোমার বাবা কোথায়?"

কবিতা ঠোঁট উল্‌টে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, "কে জানে, বাবা কোথায়?" বলেই ঘরের ভিতর দিয়ে, বাইরের দিকে চলে গেল।

কাকীমা রমার দিকে তাকিয়ে রাগে আর বিরক্তিতে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস? ভেজা শাড়িটায় মাটির দাগ ধরে যাচ্ছে না?"

রুমি তাড়াতাড়ি ভেজা শাড়িটা গুটিয়ে নিয়ে কলতলার দিকে যেতে যেতে বললো, "এই যে যাচ্ছি!"

কাকীমা উঠোনে নেমে এসে বললেন, "সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে কাদার দাগ তুলবি। তোর আর কি, যতো খুশি সাবান খরচ করবি, গায়ে তো লাগে না।" তিনি ফিরে তাকান অবনীশের দিকে, বিপরীত দিকের ঘরের বারান্দায় যেতে যেতে বললেন, "দেখলে তো? একটা কাজও যদি এ মেয়েটাকে দিয়ে হয়। কিছু বললেই ফ্যাল ফ্যাল করে

তাকিয়ে থাকবে, যেন ওর মতো ভালো মানুষ আর হয় না। সামান্য একটা কাপড় তারে মেলে দেবে, তাও গতরে কুলোয় না। এমন তো না যে তোকে খেতে দেওয়া হয় না। সব হচ্ছে নষ্টামো, বুঝলে? ওই যে গায়ে একরত্তি রূপ আছে, দেমাকেই গেল। আরে মর ছুঁড়ি, বাপ মা খেয়ে বসে আছিস পেট থেকে পড়তে না পড়তেই, তোর রূপ দিয়ে কি হবে?" কাকীমা উঠে এলেন বারান্দায়।

অবনীশের মুখ অপ্রস্তুত আর গম্ভীর, জিজ্ঞেস করলো, "মাসীমা, মেসোমশাই কোথায়? বাড়িতে শুনলাম, উনি আমার খোঁজ করছিলেন।"

"কি জানি বাবা তোমার মেশোমশায় কোথায়?" কাকীমা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "যারা কাজের লোক তারা তবু একদণ্ড বসতে পারে, বেকার লোকের কাজের অন্ত নেই। দেখো গিয়ে, কোথায় টই টই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অবনীশ কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেন, মেসোমশাই যে দমদমের গান্ধী বিদ্যাপীঠে কাজ করছিলেন?"

"গান্ধী বিদ্যাপীঠে!" কাকীমা ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, "ও সব নামে ডাকেই গগন ফাটে, বর্ষায় না কিছুই। ছ' মাসের মাইনে দেয় নি, আজ দেবো, কাল দেবো করে কাটাচ্ছিল। মাঝে আবার কে ভাঙচি দিল, কোন্ সরকারি ইস্কুলে নাকি পাকা চাকরি করে দেবে। তা সে আজও দিচ্ছে, আর কালও দিচ্ছে। আর ঘুষ খেতে গিয়ে আগের ফুড ডিপার্টমেন্টের চাকরি খুইয়ে, এখন ইস্কুল মাস্টারি। অনেক মাস্টারিই করবে এখন।"

কাকীমার কথা শেষ হবার আগেই, অবনীশ পিছন ফিরে চলে গেল। ইতিমধ্যে শাড়িটা ধুয়ে, রুমি আবার উঠোনে ফিরে এলো। কাকীমার দৃষ্টি ওর ওপরে। রুমিও তা জানে। ও খুব সাবধানে, অনেকটা উঁচুতে, পাকানো শাড়িটা ছুড়ে দিল। এবার আর ব্যর্থ হলো না। সচরাচর ব্যর্থ হয়ও না। কিন্তু মানুষের হাত মেসিন

না, মাঝে মাঝে হঠাৎ হাত ফসকে যায়। গেলে কাকীমার কাছে ক্ষমা নেই।

রুমি একাধিক শাড়ি আর ধুতি, রীতিমতো কসরৎ করে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঁচু তারে ছুড়ে টেনে টেনে মেলে দিল। নীচু তারে দিল ছোটদের জামা প্যান্ট। কাকীমা বললেন, "যা, রান্নাঘরে রুটি তরকারী রাখা আছে, এবার গিয়ে খেয়ে নে।"

কাকীমার কথা শেষ হবার আগেই, বুক খোলা পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবকের আবির্ভাব হলো ঘরের সামনের বারান্দায়, বললো, "মা, আমাকে তাড়াতাড়ি খেতে দাও। দোকানে কেষ্টকে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

কাকীমা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে রুমিকে বললেন, "রমা, তুই তো হলে পরে খাস্, আগে মধুকে খেতে দে। ছাখ্, মধুর জন্যে সকালে তৈরি টাটকা রুটি, বেগুন ভাজা আর মিষ্টি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তোর জন্যে রাখা বাসি তরকারি রুটি যেন আবার মধুকে দিয়ে বসিস না।"

রুমি বালতিটা কলতলায় রাখতে যাচ্ছিল। নতুন আদেশ পেয়ে বালতিটা রেখেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। মধু চেঁচিয়ে বললো, "রমা, একটু চায়ের জল বসিয়ে দিস্।"

রমা ঘাড় কাত করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। কাকীমা বললেন মধুকে, "মধু, তোর ছোটখাটো দোকানটাই এখন সংসারের যা কিছু ভরসা। যাকে তাকে দোকানে বসিয়ে রেখে আসিস, কোন্ দিন দেখবি চুরি-টুরি করে পালিয়েছে।"

"অত সস্তা নয়।" মধু বললো, "আমার নাম মধুসূদন সেন। দোকানের মালপত্তর সব আমার নখদর্পণে, চুরি করা এত সহজ নয়। আর যাকে তাকে আমি বসাইও না। তা হলে তো বাবাকে বসতে দিতাম। কিন্তু জানি বাবা আমার কবর খুঁড়বে। এই তো আজ সাত সকালেই গিয়ে বাবা হাত পেতেছে, একটা টাকা দিতেই হলো।"

"কেন দিস্ ?" কাকীমা ফুঁসে উঠলেন, "জানিসই তো, ওই টাকা দিয়ে সিগারেট কিনে ফুঁকবে, আর পাড়ার ছোঁড়াদের সামনে বড় বড় লেকচার দেবে।"

মধু বললো, "মোটেই নয়, সেদিকে বাবা খুব চালাক। উল্‌টে পাড়ার ছোঁড়াদেরই ঘাড় ভেঙে খায়, আর কৃষ্টি আর সংস্কৃতি করে। বাবা তো এখন এ পাড়ার ক্লাবের সহ-সভাপতি।"

"তা তো হবেই। ঘরে তো আর পতিত্ব করতে পারলো না, এখন ক্লাবের সভাপতিই হতে হবে!" কাকীমা বললেন, "কিন্তু মধু, বেলা তো অনেক হয়ে গেল, বাজারটা না করে দিলে নয়।"

মধু তৎক্ষণাৎ মুখ ফেরালো, "এখন আর আমার বাজারে যাবার সময় নেই। সেই কোন্ ভোরে গিয়ে দোকান খুলেছি, এখন একটু খেতে এসে—ও সব আমি পারবো না।"

রুমি খাবার নিয়ে সামনে এসে পড়ে, মধুকে বলে, "চলো, খেতে বসবে।"

মধু বললো, "রমাই তো বাজারটা করে নিয়ে আসতে পারে। ওর আর এখন কী কাজ আছে?" বলতে বলতে ঘরে ঢোকে।

পাশাপাশি তিনটি ঘর। একটি ঘরের দরজা খুললেই রাস্তা। ঘরের আসবাবপত্র অতি সামান্য। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবাবেব যে রকম হয়। বাইরে যাবার রাস্তার ধারের দরজাটা খোলাই ছিল। ভিতরে ছোট উঠোন, আর রান্নাঘর, পাশে পাঁচিল ঘেরা, টিনের ঝাঁপ-দরজা ঢাকা কলতলা।

খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়। মধু দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভাই বোনদের পড়ার নড়বড়ে টেবিলের পাশে, একটা হাতলবিহীন চেয়ার সশব্দে টেনে নিয়ে বসলো। রুমি টেবিলে খাবার রেখে বললো, "খাও, আমি জল দিয়ে, চা করে নিয়ে আসছি।"

কাকীমাও ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকলেন, রুমিকে পিছন থেকে বললেন, "তাড়াতাড়ি কর, বাজার যেতে হবে।"

মধুও তাকিয়েছিল রুমির দিকে। মুখে রুটি পুরে দিয়ে, নীচু বিকৃত স্বরে বললো, "বাবাকে যে পাড়ার ছোঁড়ারা এত খাতির করে, তার কারণ আর কিছু না, আমাদের রমা। সব ছোঁড়াগুলোর নজর রমার দিকে।"

রুমি বারান্দায় রাখা কলসী থেকে, গেলাসে জল গড়াতে গড়াতে, কথাগুলো শুনতে পায়। গেলাস ভরে গিয়ে খানিকটা জল চল্‌কিয়ে পড়ে যায়। কাকীমার স্বর শুনতে পেল—"সে কি আর আমি বুঝি না ভেবেছিস? সেই জন্যেই তো রমাকে আমি বাড়ির বাইরে বিশেষ যেতে দিতে চাই না।"

মধুর অবাক স্বর, "তাতে কী লাভ? ওকে তো বাজার দোকান সবই করতে হয়।"

"হয়, তা জানি।" কাকীমার স্বর শোনা গেল, "তারপর কোন্ দিন দেখবো, একটা ভালো ছেলে রমাকে পছন্দ করে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। ভুলে যাস্‌নে, তোরও হুটো আইবুড়ো বোন আছে।"

রুটি মুখে মধুর বিকৃত স্বর, "সে তো কপালের ব্যাপার, আমি কি করতে পারি?"

"কপাল না ছাই।" কাকীমার বিরক্ত স্বর শোনা গেল, "তোর আর তোর বাপের উচিত, এখন থেকে নিজের বোনেদের জন্য চেষ্টা চরিত্র করা।"

হাসির সঙ্গে মধুর ব্যঙ্গের স্বর শোনা গেল, "তুমি কি ভেবেছো, বাবা রমার বিয়ের জন্যে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে? মোটেই না। আসলে রমাকে দেখিয়ে পাড়ার ছোঁড়াদের ঘাড় ভাঙার ফিকির।"

"বুড়ো ভাম্!" কাকীমা বলে উঠলেন।

মধু চেঁচিয়ে উঠলো, "কই রে রমা, জল কি গঙ্গা থেকে নিয়ে আসছিস?"

অন্যমনস্ক রুমি জলের গেলাস হাতে চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে জলের গেলাস টেবিলে রাখতে রাখতে মিথ্যা কথা বললো, "চায়ের জলটা ফুটে গেছলো, পাতা ভেজাতে দিয়ে জল নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।" বলেই সেখান থেকে চলে গেল। মধুকে খেতে দেবার আগে, উনোনে চায়ের জল বসিয়ে গিয়েছিল, সেটা মিথ্যা না। কিন্তু চা পাতা ভেজানো হয় নি। ও প্রায় দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে ফুটে যাওয়া জলের কালি ধরা কেটলি নামিয়ে, তাড়াতাড়ি চায়ের পাতা ঢেলে দিল। একটু বেশী করেই গুঁড়ো চায়ের পাতা দিল, যাতে তাড়াতাড়ি লিকারের রঙ হয়। কেটলিটা বার কয়েক ঝেঁকে, কাঁচের গেলাসে খয়েরি রঙের ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে, চায়ের জল ঢাললো। দেখা গেল, রঙটা ঠিক আছে। আশেপাশে রাখা দুধ আর চিনি নিয়ে গেলাসে ঢেলে, রঙ ওঠা ক্ষয়াটে চামচ দিয়ে দ্রুত কয়েকবার নেড়ে নিয়ে ছুটলো। ছুটে দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কাকীমার স্বর শুনতে পেল, "তুই কি ভেবেছিস, রমার বাবা কিছু টাকা না রেখে গেলে, তোর বাবা রমাকে এ বাড়িতে এনে তুলতো? এত ভাইঝি সোহাগ তোর বাবার নেই।"

মধুর অবাক স্বর, "জ্যাঠামশাই বাবাকে টাকা দিয়ে গেছে! কত টাকা, কোথায় সেই টাকা?"

"তা আমি বলতে পারব না।" কাকীমার গলা শোনা গেল, "প্রায় ছ' বছর আগের কথা, তোর জ্যাঠা মারা গেছে। সে টাকা কি তোর বাবা রাখতে পেরেছে? কবেই হয়তো ফুঁকে দিয়েছে।"

মধুর স্বর, "আমি যদি জানতে পারতাম, তা হলে বাবার কাছ থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিতাম। জ্যাঠামশাই কালেক্টরিতে কাজ করতেন, মাইনে ভালোই পেতেন। তার সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাও ছিল। খরচ বলতে তো ছিল দুজনের, জ্যাঠা আর রমা। জেঠি তো কবেই পটল তুলেছিল। তুমি তা হলে নিশ্চয়ই জানতে, বাপ জ্যাঠার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে?"

কাকীমার কোনো কথা শোনা গেল না। মধুর স্বরই আবার শোনা গেল, "এই বেলায় তোমার মুখে কথা ফোটে না। রমা নিশ্চয়ই টাকার কথা জানে।"

"বোধ হয় না।" কাকীমার স্বর, "ও তখন আরো ছেলেমানুষ ছিল, টাকা পয়সার কথা ও আর কী করে জানবে। কিন্তু মধু, ও সব ভেবে আর লাভটা কি? দে তুই বাজারের টাকাটা দে তো।"

রুমির চোখে মুখে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা, অথচ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়ায় ঢাকা। ও তাড়াতাড়ি ধূমায়িত চায়ের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকে, টেবিলের ওপর গেলাস রাখলো। মধু বাঁ হাত পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে একটি পাঁচ টাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর ছুড়ে দিল।

কাকীমা নোটটা নিয়ে বললেন, "মোটে পাঁচ টাকা দিলি? যা আক্রার বাজার! এতগুলো মানুষের জন্য পাঁচ টাকার বাজার কিছুই না।"

মধু ঢকঢক করে জল খেয়ে গেলাসের মধ্যেই হাত ডুবিয়ে ধুয়ে নিল। পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বের করে হাত মুছে বললো, "যা হয়, এই পাঁচ টাকাতেই সারতে হবে। রোজ রোজ মাছের টাকা আমি দিতে পারবো না। নিরামিষ খেতে এই পাঁচ টাকাই যথেষ্ট।" সে চায়ের গেলাস তুলে নিল।

"তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস?" কাকীমা রমার প্রতি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাজারে যা।"

রুমি টেবিলের ওপর থেকে এঁটো থালা গেলাস নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। থালা গেলাস একপাশে রেখে, ঘটির জল দিয়ে নর্দমার মুখের কাছে হাত ধুয়ে নিল। ডেয়ো ঢাকনা থালা বাসন ঘেঁটে ওর জন্যে রাখা রুটি আর তরকারি বের করলো। মেঝের ওপর বসেই খাবার মুখে দিতে গিয়ে, ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। নাকের পাটা কুঁচকে গেল কঞ্চিত হলো। আবার খাবার তুলে শুঁকে, ঘাড়টা ঝটকা

দিয়ে সরিয়ে খাবারের পাত্র নিয়ে বাইরে এলো। বিপরীত দিকে তাকিয়ে দেখলো। ওর চোখে মুখে একটা ত্রস্ত ভয় আর বিতৃষ্ণা। তাড়াতাড়ি ছুটে কলতলায় গেল।

কলতলার মাথার ওপরে কোনো ঢাকনা নেই। পাঁচিলটা রাস্তার ধারেই। ও বাসি পচা খাবার মুঠো মুঠো তুলে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেললো। পা ডিঙি দিয়ে, এমন ভাবে ছুড়লো, যেন রাস্তার মাঝখানে, কারোর গায়ে গিয়ে না পড়ে। তারপরে দ্রুত হাতে বাটি ধুয়ে, মুখ কুলকুচো করে, রান্নাঘরে ছুটে গেল। একটা গেলাস নিয়ে, বারান্দায় রাখা কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে পান করলো।

"খাওয়া হয়ে গেল!" কাকীমা দরজা দিয়ে বাইবে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

রুমি থতিয়ে উঠলো, আর খানিকটা জল ওর বুকের কাপড়ে চল্‌কে পড়লো। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, "হ্যাঁ!"

কাকীমার চোখে তথাপি যেন একটা সন্দেহের ছায়া, বললেন, "এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলি?"

রুমি সহজ ভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললো, "হুঁ।"

"পেটে কি রাক্ষস পুষে রেখেছিস নাকি?" কাকীমা বললেন, "চোখের পলক পড়তে না পড়তে গেলা কোটা শেষ! নে, বাজারের ব্যাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি যা। শোন্, টাকা তিনেকের মধ্যে আলু আর কিছু তরি তরকারি কিনবি, আর বাকি ত্ব' টাকায় যা হোক কিছু টাটকা চুনো-চানা মাছ নিয়ে আসবি। আমি আঁশ ছাড়া ভাত খেতে পারি না।"

রুমি একবার ঘাড় কাত করে বললো, "আমি কাপড়টা একটু বদলে নিই।"

"থাক, এখন আর কাপড় বদলাতে হবে না। যাবি তো বাজারে, তার পটের বিবি সাজার কী দরকার?" কাকীমা মুখ ঝামটা

দিয়ে বলে উঠলেন, "তোর জন্যে বেলা দুটো পর্যন্ত বাজার বসে থাকবে নাকি?"

অগত্যা রুমিকে, যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই টাকা আর ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতে হলো। বেরোবার আগে অবিশ্যি পায়ে স্যাণ্ডেলটা দিতে ভুললো না।

রুমি বাজার করে কোনো দিনই কাকীমার কাছে সুখ্যাতি পায় নি, কিন্তু বাড়ি থেকে অদূরের এই বাজারে আসার মধ্যে কেমন যেন একটা মুক্তির স্বাদ লুকিয়ে থাকে। মুক্তি এবং আনন্দ। অনেক মাছ তরি-তরকারি বিক্রেতাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গিয়েছে, কারণ বাজার দোকানের কাজটা প্রায়ই ওকে করতে হয়। ওর সব থেকে ভালো লাগে গ্রাম থেকে সবজী নিয়ে আসা গ্রামের মেয়ে বউদের। ওদের কারো সঙ্গে কোলের শিশুও থাকে। সবজীর টুকরো-টাকরা আর যাবতীয় মানুষের পায়ের ধুলোর জঞ্জালের মধ্যে, শিশুগুলো আপন মনে খেলা করে। রুমির বয়সী বা ওর থেকেও ছোট মেয়েরা, লোকজনের সঙ্গে দরদস্তুর করে শাক পাতা বিক্রী করে। রুমিকে দেখলে, ওরা অনেকেই ডাকাডাকি করে "দিদিমণি, আমার কাছে এসো, সব টাটকা পাবে।"

রুমির সবাইকে ভালো লাগে। সকলের কাছ থেকে সবজী কিনতে পারে না, কিন্তু যে ডাকে তার সামনেই গিয়ে দাঁড়ায়। ওর সমবয়সী বা ওর থেকেও ছোট এই সবজী পসারিণী মেয়েদের যে কথাটা ওরই জিজ্ঞেস করা উচিত, সেই কথাটা মেয়েরাই ওকে জিজ্ঞেস করে, "হ্যাগো দিদিমণি, তুমি ইস্কুলে পড়ো না?"

রুমি প্রথম যখন শুনেছিল, তখন একটা অপমানকর গ্লানি ওর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সত্যি কথাটা বলতে ওর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওর বয়সী একটি ভদ্র পরিবারের মেয়ে ইস্কুলে পড়ে না, এটা শাক-পাতা বেচে খাওয়া মেয়েদের কাছে রীতিমত একটা অবাক জিজ্ঞাসা।

অবিশ্যি রুমি লেখাপড়া একেবারেই করে নি তা নয়। বাবা বেঁচে থাকতে ও ক্লাস সিক্স অবধি পড়েছিল। বাবা মারা যাবার পরে কাকার সংসারে এসেও নতুন ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়েছিল। কিন্তু ক্লাস এইটে উঠতে না উঠতেই, শুধু ওর লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই কাকার অর্থের অনটনটা যেন অতিরিক্ত সংকটজনক হয়েছিল। মাসের পর মাস মাইনে বাকি পড়েছিল। তারপরে একদিন যথা নিয়মে নাম কাটা গিয়েছিল। সেই দিনটা রুমি সকলের সামনেই কেঁদে উঠেছিল। জবাবে কাকীমা ঝংকার দিয়ে উঠেছিলেন, "এর জন্য আবার কান্নাকাটি কিসের? আমরা যে লেখাপড়া শিখি নি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখেই বা কী হবে? বিদ্যেসাগর তো হবি না। তা ছাড়া অভাবে পড়ে না পড়াতে পারলে, কী করবার আছে? ও সব কান্নাকাটি রাখ। সংসারের কাজকর্ম শেখ, আখেরে কাজ দেবে।"

কাকীমা রুমির ক্ষেত্রে এ কথা অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন, কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েদের বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি। যুক্তির দিক থেকে, বালিকা রুমির মনেও জিজ্ঞাসাটা জেগেছিল। জিজ্ঞেস করবার সাহস পায় নি। জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয় কাকী উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধারণ করতেন। সেই থেকে ওর ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ। আর ওর থেকে বড় সবিতা, সমবয়সী কবিতা, দুই বোন আর ভাই খোকন নিয়মিত ইস্কুলে যায়। ওদের পড়ার খরচ ঠিক চলে যায়। আর ওদের সময় মতো নেয়ে খেয়ে ইস্কুলে যাবার জন্য, ওকে কাকীমার সঙ্গে রান্নাঘরে তাল দিতে হয়।

কিন্তু গ্রাম থেকে আসা গরীব সবজীওয়ালা সরল মেয়েদের কাছে রুমি মিথ্যে কথা বলতে পারে নি। প্রশ্নটা শুনে ওর ভেতর কান্না গুমরে উঠেছিল, লজ্জা বোধ করেছিল, তথাপি নিজেকে সামলিয়ে, এবং একটু করুণ হেসে বলেছিল, "না, আমি ইস্কুলে পড়ি না।"

ওরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "ও মা, সে কি গো! কেন?"

রুমির অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, "আমরা যে বড় গরীব!"

রুমি আশ্চর্য ব্যথার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল, ওদের সকলের চোখে মুখেই এক করুণ সমবেদনা। সেই সমবেদনার জন্য, ওর মনে কোনো গ্লানি জমে নি। ওর নিষ্ঠুর আর নিঃসঙ্গ জীবনে, সেটা এক সান্ত্বনা। ভেবেছিল, সংসারে সবাই নির্দয় নয়, প্রীতি এবং ভালবাসা সবার, সমস্ত মানুষের হৃদয় থেকে হারিয়ে যায় নি। ফলে দাঁড়িয়েছিল, ওকে দেখলে গ্রামের পসারিণী মেয়েরা, তাদের দুঃখের পসরা দিয়ে ওর ব্যাগ ভর্তি করে দেয়। পয়সার মূল্যে, যা অনেক বেশি। রুমি লজ্জা পায়, বিব্রত হয়। কিন্তু ওরা এত অনায়াস আর সহজ, ওদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। অথচ মনে কোনো গ্লানিও জমে না।

রুমির সব থেকে ভালো লাগে এক বুড়িকে, আদ্যিকালের ছাপ যার চোখে মুখে। বলতে গেলে থুথুড়ি বুড়ি। রুমি ভেবে অবাক হতো, কী করে বুড়ি দূর গ্রামাঞ্চল থেকে শাক তরি-তরকারির বোঝা এ বয়েসে বসে নিয়ে আসে, কেনই বা আসে। ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই বয়সে এত মালপত্র বয়ে নিয়ে আসো, তোমার কষ্ট হয় না?"

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে বলেছিল, "হয় না আবার? খুব কষ্ট হয় গো দিদি। কিন্তু কী করবো বলো, না এলে খাওয়া জুটবে কেমন করে?"

রুমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন, তোমার ছেলেরা নিয়ে আসতে পারে না?"

বুড়ির আদ্যিকালের লোলরেখা মুখে করুণ বিষণ্ণ হাসি ফুটেছিল, বলেছিল, "তুমি আমার নাতনীর বয়সী, তোমাকে আর কী বলবো গো দিদি। সব মরে হেজে, ছেলে আমার একটা আছে বটে। তার কিছু জমিজমা চাষ-আবাদও আছে। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, সে আমাকে খেদিয়ে দিয়েছে, খেতে পরতে দেয় না।"

রুমি দেখেছিল, কথাগুলো বলতে বলতে বুড়ির গলার শিরাগুলো কাঁপছিল। যেন সে উদ্‌গত কান্নাকে দমন করার চেষ্টা করছিল। রুমির বুকটা টনটনিয়ে উঠেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন খেতে পরতে দেয় না?"

বুড়ি হাত তুলে বলেছিল, "মর্জি গো দিদি। পেটের ছেলে হলেও, মানুষের মন যে কখন কোন্ টানে চলে, তা বিধেতা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। যখন মরে যাবো, তখন হয় তো আমার ছেলেটা কাঁদবে।"

বুড়ির শেষের কথাটা যুগপৎ বিদ্রূপাত্মক আর করুণ সুরে বেজে উঠেছিল। রুমির মনে কেন যেন ওর নিজের জীবনটার কথাই মনে পড়েছিল। ও জানতো না, জীবনের নানান্ জটিলতা, দুঃখ কষ্ট, অথচ এক করুণ হাসির মধ্য দিয়ে, সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ও মনে মনে বড়ো হয়ে উঠছিল।

সেই বুড়িই একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "তা হ্যাঁ গো দিদি, তোমার বাবা কী করে?"

রুমি বলেছিল, "আমার বাবা মারা গেছেন।"

বুড়ি যেন আচমকা দুঃখে বলে উঠেছিল, "আহাহা, এই বয়সে বাপ হারিয়েছো! বিধবা মায়ের মেয়ে, সেও যে বড়—।"

"আমার মা আরো অনেক আগেই মারা গেছেন।" রুমি বাধা দিয়ে বলেছিল।

বুড়ির লোলরেখা মুখটা ক্ষয়িষ্ণু পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি, কেবল হাঁ মুখ

দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছিল। তারপরে যেন আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, "তবে কার কাছে থাকো তুমি?"

"আমার কাকার কাছে।" রুমি জবাব দিয়েছিল।

কথাটা গ্রামের সবজীওয়ালাদের মধ্যে রটতে দেরি হয় নি। এমন কি খাল বিল থেকে সারা রাত মাছ ধরে, ভোরবেলা যারা বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসে রুমির কথাটা তারাও জানতো। তারা কেউ বড়লোক নয়, গ্রামের অতি সাধারণ গরীব। কিন্তু রুমির প্রতি তাদের সকলের বিশেষ স্নেহ আর প্রীতি, দুই ভিন্ন জগতের মধ্যে যেন একটি অদৃশ্য সম্বন্ধে গড়ে তুলেছিল।

শুধু এই মানুষগুলো না, বাজারটা উপছে এসে পড়েছে বড় রাস্তার ওপর। রুমি বাজার করে, বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা অজস্র গাড়ি-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ওর মনটা উধাও হয়ে যায় এক অজানা দূরে। এই সব মিলিয়ে বাজারে যাওয়াটা ওর কাছে একটা মুক্তির আনন্দ।

রুমি বাজার করে ফিরছিল। পাড়ার মধ্যে, মান্ধাতা আমলের প্রাচীন, ইঁট বের করা বাড়ির রকের ওপর একদল ছেলে বসে ছিল। রুমি জানে, বাড়িটার মালিকরা এখন গরীব হয়ে গিয়েছে। নিতান্ত নিরুপায় গরীব শরিকরা এখনো কেউ কেউ থাকে। কিছু কিছু ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। রাস্তার দিকে একটা ঘরে পাড়ার ছেলেদের "ইয়ং মেন এ্যাসোসিয়েশন" আছে। তারই রকে এখন জটলা চলছে। অবিশ্যি একই পাড়ার মধ্যে "উদয়াচল" নামে আরও একটি ক্লাব আছে, এবং দুই ক্লাবের মধ্যে, খেলাধূলা গান নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সবকিছু নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

ক্লাবের ছেলেরা পাড়ার চেনাশোনা মেয়েদের প্রতি তেমন অশালীন আচরণ করে না, যতোটা করে বাইরের অচেনা মেয়ে দেখলে। কিন্তু

পাড়ার যে সব মেয়েদের কিছু কিঞ্চিৎ রূপ আছে, তাদের সঙ্গে ডেকে ভাব জমাতে না পারলেই, ওরা বড় শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সেই দলের মেয়েদের মধ্যে রুমিও পড়ে। ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, জবাব দিতেই হয়। আত্মসম্মান বজায় রাখার সেটাই একমাত্র উপায়, এটা রুমি দেখে আর ঠেকে শিখেছে। যে সব মেয়েরা বিপরীত আচরণ করে, তাদের কপালে 'হিড়িক' ব্যাপারটা নির্ঘাৎ জোটে। অথচ ওদের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললে, বা ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দিলে, ওরা ভীষণ খুশি।

ওদের দাবীটা এমন কিছু বেয়াদপি বা বিরাট নয়। তাছাড়া ওদের মধ্যে অনেক ছেলেই আছে, লেখাপড়া বা নানা দিক থেকেই যাদের নানা যোগ্যতা আছে। ওদের অপরাধ তো একটাই। অনেকেই বেকার, অতএব সকাল বিকাল ক্লাবের ঘর অথবা রক ছাড়া বাড়িতেই বা কতোক্ষণ ভালো লাগে।

রুমি আরো বিশেষ করে মনে মনে সচেতন থাকে, ওর বাবা মা নেই। এ পাড়ায় ও কাকার বাড়িতে থাকে। মনে মনে এই অসহায় অবস্থাটা ওকে অনেকখানি নম্র করে রাখে, কিন্তু সম্মানহানিকর কোনো কিছুই ও মেনে নেয় না। রুমি ক্লাবের রকের কাছাকাছি আসতেই, কাকার ডাক শুনতে পেল, "এই রমা, শোন। একবার এদিকে আয়।"

রুমি ক্লাবের রকের দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল। দূর থেকে যখন লক্ষ্য করেছিল, তখন কাকাকে চোখে পড়ে নি। এখন কাকার ডাক শুনে ওকে থামতেই হলো, ফিরে দাঁড়াতেও হলো। মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ আগে জলখাবার খেতে বসে মধুদার কথা। কাকার ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে, মধুদা রুমির নাম জড়িয়ে একটা নোঙরা ইঙ্গিত করেছিল। ঘরের বাইরে বারান্দায় গেলাসে জল গড়াতে গড়াতে, ও কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। সেই কারণেই, রুমি ক্লাবের বারান্দার দিকে ফিরেও,

এগিয়ে গেল না, বললো, "কাকা, আমি বাজার নিয়ে গেলে রান্না হবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাকীমা রাগ করবেন।"

"আরে তোর কাকীমাকে আমি সামলাবো।" বীরেন সেন বললেন, "একবারটি এদিকে আয়। ছেলেরা তোকে কী একটা কথা বলতে চায়।"

রুমি দেখলো, ক্লাবের ছেলেরা সাগ্রহ চোখে, মুখে হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সব ক'টি মুখই ওর চেনা, নামও জানা। রুমি বুঝতে পারলো, কাকার অবাধ্য হওয়া সম্ভব না। তা ছাড়া স্বয়ং কাকা যেখানে ওকে ডাকছেন, সেখানে না গেলে, ছেলেরা পরে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ নেবে। ও আস্তে আস্তে রকের দিকে এগিয়ে গেল। ওর কাকা বীরেন সেন বলে উঠলেন, "রমা আমার লক্ষ্মী আর বাধ্য মেয়ে, আসবে না মানে?"

একটি ছেলে বললো, "বীরেনদা, অমিত বলেছিল, আপনি ডাকলেও রমা আসবে না।"

রুমি জানে, অল্পবিস্তর টাক মাথায় পসর চুল প্রৌঢ় কাকাকে ছেলেরা দাদা বলেই ডাকে, এবং কাকা তাতে মনে মনে বেশ খুশি। যে ছেলেটি কথাটা বললো, তার নাম স্বপন। রুমিই বলে উঠলো, "কেন আসবো না। কাকা ডেকেছেন, আমি আসবো না? তোমরা ডাকলেও তো আমি তোমাদের কথা শুনি।"

ছেলেরা হৈ হৈ করে হেসে উঠলো। কাকা বললেন, "কই রে অমিত, এবার জবাব দে।"

অমিত হাত জোড় করে বললো, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে বীরেনদা, আর কখনো এই রকম বলবো না। রমা সত্যি নিরহঙ্কারী মেয়ে।"

"কিন্তু তুমি আমাকে দু'দিন শুনিয়ে শুনিয়ে দুটো খুব বাজে কথা বলেছো।" রুমি অমিতকে বললো, "এখন কাকাকে সে কথা বলে দিই?"

অমিতের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, অপ্রস্তুত লজ্জায় মুখ নামালো। ছেলেরা সব ওর পিছনে লাগলো, টিটকারি দিয়ে বিদ্রূপ করলো। দু-একজন রেগেও গেল, বললো, "বীরেনদার ভাইঝিকে ছিড়িক? তোর লজ্জা করে না অমিত?"

দেবাশীষ নামে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলো, "অমিত তোমাকে কী বলেছিল?"

"সে-কথা আমি মরে গেলেও মুখে আনতে পারবো না।" রুমি গম্ভীর অথচ সলজ্জ ভঙ্গিতে বললো।

কাকা ব্যাপারটার ইতি টানবার উদ্দেশ্যে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠাট্টা ইয়ারকি খারাপ নয়, কিন্তু মেয়েদের আজেবাজে কথা একদম বলা উচিত নয়। অমিত আর কখনো ও রকম বলবে না।"

অমিত বলে উঠলো, "আমি রমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

ছেলেরা সবাই হেসে উঠে, অমিতের পিঠ চাপড়িয়ে দিল।

কাকা বললেন, "ভেরি গুড! এর পরে আর কারো কোনো কথাই থাকতে পারে না। এবার তোমরা রমাকে কী বলতে চেয়েছিলে, বলে ফ্যালো।"

স্বপন বললো, "দেবাশীষ ক্লাবের সেক্রেটারি, সুতরাং দেবাশীষই বলবে।"

দেবাশীষ হঠাৎ বড় লাজুক হয়ে উঠলো, বললো, "না না, আমি কেন, বীরেনদা থাকতে আমি কেন বলবো? যা বলবার বীরেনদাই বলবেন।"

রুমি জিজ্ঞাসু উৎসুক চোখে কাকার দিকে তাকালো। কাকা হেসে বললেন, "এই ত্যাখো, আবার আমাকে কেন? তোমাদের কথা তোমরাই বলবে।"

দেবাশীষ বললো. "বীরেনদা, আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট। আপনি থাকতে আমরা কিছুই না।"

"তুমি খুব চালাক দেবাশীষ।" কাকা হেসে বললেন, এবং রুমির দিকে ফিরে বললেন, "শোন্ রমা, সামনে আটুই মে ক্লাব থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তী করা হচ্ছে। এরা সবাই চাই তুই সেদিন একটা আবৃত্তি করবি।"

রুমি যেন আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললো, "আমি আবৃত্তি করবো! আমি কি আবৃত্তি করতে জানি নাকি?"

কাকা মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, "হুঁ হুঁ, তুই ভেবেছিস আমি কোনো খবর রাখি না? গত শনিবার তোর কাকীমা গেছলো দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। সবিতা কবিতারা ছিল ইস্কুলে। সেই সময় তুই আপন মনে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আবৃত্তি করছিলি, আমি নিজের কানে শুনেছি। তুই অবিশ্যি জানতিস না, যে আমি আড়ি পেতে শুনেছিলাম।"

ছেলেরা সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো রুমির মুখ। কাকা কথাটা মিথ্যে বলেন নি। একলা অবকাশ যাপনের সুযোগ ওর খুবই কম, কিন্তু অবকাশ পেলেই, ও আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করে। কেবল রবীন্দ্রনাথ না, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, যে কবিতার বই হাতের কাছে পায় তা-ই আবৃত্তি করে। শুধু আবৃত্তি না, বিশেষ বিশেষ কথিকার টুকরো, বা নাটকীয় গদ্য অংশও, ও ওর সুরেলা গলায় পাঠ করে, আর তার মধ্যে ও অনুভব করে একটি গভীর আনন্দ, ওর পিতৃমাতৃহীন জীবনে খুঁজে পায় শান্তি, ভুলে থাকতে পারে জীবনের নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনা। কিন্তু সে সবই ওর নিতান্ত একার, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। কাকা যে কোন্ ফাঁকে শুনে নিয়েছিলেন কে জানে। ও ত্রস্ত লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "না না, ছি ছি, ও কি আবার আবৃত্তি নাকি? লোকজনের কাছে আমি ও সব কিছুতেই পারবো না।"

"ছি ছি মানে?" কাকা বললেন, "আমার কানকে তো আর আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।" বলে তিনি ছেলেদের দিকে

ফিরলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো নাম করা মহিলা শিল্পীর আবৃত্তির রেকর্ড বাজছে। পরে যখন উঁকি দিয়ে দেখলাম, রমা আবৃত্তি করছে, আমি তো একেবারে থ। অবিশ্যি কবিতাও আমাকে বলেছে, রমা নাকি খুব সুন্দর আবৃত্তি করে। তখন তেমন কান দিই নি। গত শনিবার নিজের কানে শোনার পরে কান না দিয়ে আর উপায় ছিল না।"

ছেলেরা আবার হেসে হৈ হৈ করে উঠলো। রুমি সকাতর লজ্জায় বলে উঠলো, "কাকা! আমি পারবো না।"

দেবাশীষ রুমির কাছে এগিয়ে এসে বললো, "রমা, আমাদের রিকোয়েস্ট তোমাকে রাখতেই হবে।"

অপ্রস্তুত লজ্জিত রুমি বলল, "কিন্তু—।"

"কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়।" স্বপন এগিয়ে এসে বললো, "কথা তোমাকে রাখতেই হবে রমা।"

শুভঙ্কর নামে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললো, "তাছাড়া এ তো আমাদের পাড়ার ব্যাপার। যা করবো সব আমরা পাড়ার ছেলে-মেয়েরাই করবো। তার মধ্যে তুমিও আছো।"

দেবাশীষ বললো, "এটা তো কোনো কমপিটিশনের ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের যে কোনো কবিতা তুমি বেছে নিতে পারো। কিন্তু একবার যখন জানতে পেরেছি, তখন আর তোমাকে ছাড়ছি না। তোমার কাছে এটা আমাদের দাবী।"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "আমাদের দাবী মানতে হবে—মানতে হবে।" বলতে বলতে সবাই হেসে উঠলো।

রুমি অসহায় লজ্জায় কাকার দিকে তাকালো। কাকা ওর কাঁধে হাত দিলেন। রুমি বললো, "আপনিই আমাকে ডোবালেন কাকা। কাকীমা শুনলে কিন্তু রাগ করবেন।"

"আরে সে ভাবনা আমার।" কাকা বললেন, "মোটের ওপর তুই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটা আবৃত্তি করছিস। এখন থেকে একটা

মনের মতো কবিতার মহড়া দিয়ে যা। যা যা, তাড়াতাড়ি বাজারের থলি নিয়ে পালা এখন, নইলে তোর কাকীমা আবার রেগে কাঁই হয়ে যাবে।"

রুমি যেন হঠাৎ আঁতকিয়ে উঠে বললো, "ও বাবা, সত্যিই তো!" বলেই প্রায় ছুটতে লাগলো। ও শুনতে পেলো না, ও ছুট দিতেই, কাকা ভাবিক্কি চালে ছেলেদের বললেন, "এবার তোমরা একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। আর আমার জন্য এক প্যাকেট ভালো সিগারেট নিয়ে এসো।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। থ্রি চিয়ার্স ফর বীরেনদা।" ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠেই চা সিগারেটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

রুমি মিথ্যা কিছু অনুমান করে নি। বাড়িতে ওর আবৃত্তি করার ব্যাপারটা জানাজানি হতেই, কাকীমা অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। আর সে অগ্নিমূর্তি রুমিকেই উঠতে বসতে দেখতে হলো। কাকীমা কোনো রকম কটু কথাই বলতে বাকি রাখলেন না, আর প্রতিটি কথাই হীন ইঙ্গিতপূর্ণ। কাকার সঙ্গেও তাঁর বিবাদ লেগে গেল।

কাকা বললেন, "এর মধ্যে অন্যায়টা কী আছে? মঞ্চে উঠে একটু আবৃত্তি করা ছাড়া তো আর কিছুই নয়।"

কাকীমা ঝংকার দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ছেলেদের ক্লাবে গিয়ে কবিতা আওড়াবে। তারপর একদিন শুনবো নাচতেও যাচ্ছে।"

কাকা তুচ্ছভাবে হেসে বললেন, "তুমি যে কী আবোল তাবোল কথা বলো। কোথায় আবৃত্তি আর কোথায় নাচ।"

কাকীমা বললেন, "জানি জানি। ও ভাবেই ঘোমটা একবার খুললে, তারপরে খ্যামটা নাচ শুরু হয়ে যাবে। তুমি আমাকে ও সব বোঝাতে এসো না।"

এ সব প্রকাশ্য বিবাদের পরে, রুমি আড়াল থেকে কাকা কাকীমার অন্য কথা শুনতে পেলো। ও বাইরের বারান্দায় থাকার জন্য গরম চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে পেলো ঘরের মধ্যে কাকীমা বলছেন, "এ সব তোমার ভীমরতি নয় তো, আর কী?"

"কেন, ভীমরতিটা কী দেখলে?" কাকার স্বর।

কাকীমা বললেন, "বলছি এই জন্যে, ভাইঝিকে নিয়ে তো খুব নাচানাচি করছো, নিজের মেয়ে দুটোর কী হবে? তোমার ভাইঝিটির না হয় রূপ আছে, কিন্তু আমার মেয়ে দুটোর? খুব তো রমাকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছ, এদিকে নিজের মেয়ে দুটোর কথা ভেবেছো একবার?"

কাকার সহাস্য নীচু স্বর শোনা গেল, "ওহ্ এই কথা! আরতি, (কাকীমার নাম) তুমি কি আমাকে এতটাই বোকা ঠাউরেছো? স্ত্রী বুদ্ধি আর কাকে বলে। আরে রমা হলো আমার কাছে ছেলে ধরার টোপ, বুঝলে? ওই টোপ দিয়েই, তোমার মেয়েদের জন্যে ছেলে ধরে এনে, ছাদনাতলায় পিঁড়েতে বসিয়ে দেবো, বুঝেছ?"

কাকীমার নিশ্চিন্ত স্বর, "যাক, তোমার ঘটে যে এতখানি বুদ্ধি আছে, তাও ভালো।"

কাকার স্বর, "আমার আছে বুদ্ধি, আর তোমার আছে খালি রাগ। রেগে কি কিছু হয় নাকি? আমি আমার মেয়েদের কথা আগে ভাববো না তো, কি রমার কথা ভাববো?"

বারান্দায় ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে, অপমানে ও ঘৃণায়, একটা দুঃসহ কষ্ট রুমির গলার কাছে ঠেলে এলো। অজান্তেই ওর হাত কাত হয়ে খানিকটা চা চলকে পড়লো। রুমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে একটা উদগত নিঃশ্বাস চাপলো, ঢেউয়ের মতো

ফুলে উঠলো বুক। তারপরে নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, বললো, "কাকা, আপনার চা নিয়ে এসেছি।"

কাকা সেই মুহূর্তে কাকীমাকে আরো কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিলেন রুমির সাড়া পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে, পাকা অভিনেতার মতো হেসে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এনেছিস ? দে দে।"

কাকীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রমাকে বললেন, "এখন যেন আবার কবিতা-টবিতা নিয়ে বসিস না, আমাকে বাটনা বেটে দিবি।"

কাকা যেন রুমির হয়ে বললেন, "আরে যাচ্ছে যাচ্ছে। বাটনা বাটা তো সারা জীবনের জন্যই আছে। মাঝে মাঝে এদিকটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে না ? কী বলিস রে রুমি ?" বলে রমার দিকে ফিরলেন, এবং দেখলেন রমা কোনো কথা না বলে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বলে উঠলেন, "কী হলো রে রমা, অমন চুপচাপ চলে যাচ্ছিস যে ? শোন্, দেবতার গ্রাসের মতো অত বড় কবিতা বেছে নিয়েছিস, মুখস্থ করছিস তো ?"

রুমি মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল, "কাকা, আমি কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমি বোধ হয় আবৃত্তি করতে পারবো না।"

"পারবি না মানে ?" কাকার স্বর কঠিন হয়ে উঠলো, "কাল বাদে পরশু ফাংশান, প্রোগ্রামে তোর নাম ছাপা হয়ে গেছে, আর এখন পারবি না বলার মানে ?"

রুমির মুখ আর চোখের দৃষ্টিও কঠিন হয়ে উঠলো। ও ফিরে তাকালো কাকার দিকে, গম্ভীর স্বরে বললো, "না পারলে কি জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন ?"

কাকা কী বুঝলেন, সহসা হা হা করে হেসে উঠে, রুমির কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বোকা মেয়ে, আমি কি তাই বলছি ? আমি জানি, বাড়িতে তোর কাকীমার খিটিমিটিতে তোর মন খারাপ

হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবে ছ্যাখ, ক্লাবের ছেলেরা এত আশা করে তোর নাম ছাপিয়ে দিয়েছে। এখন যদি তুই পারবি না বলিস, বেচারাদের প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার হয়ে যাবে।"

আর তার পরিণামও যে অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠবে, রুমি ওর এই বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়েই তা বুঝতে পারে। কেবল যে পাড়ার ছেলেরাই পিছনে লাগবে, তা না, কাকাও হয়ে উঠবেন ওর পরম শত্রু। কাকার কথার অমান্য ও কোনো মতেই করতে পারবে না। তা হলে এই সংসারেও ওর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। রুমি কেবল অসহায় না, একটা পথের ভিখারির থেকেও পরাধীন। খুড়তুতো বোনদের বিয়ের টোপের অপমান সয়েই ওকে কাকার কথায় সম্মতি দিতে হবে।

রুমি কোনো কথা না বলে, উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে চলে যাচ্ছিল। কাকা তাড়াতাড়ি বললেন, "কী রে, কিছু বললি না?"

"কী আর বলবো কাকা?" রুমি বিষণ্ণ হেসে বললো, "ক্লাবের ছেলেদের সম্মানের থেকেও তোমার সম্মান আমার কাছে অনেক বড়ো। তুমি যখন বলছো, তখন আমাকে শেষ চেষ্টা দেখতেই হবে।"

কাকা চিৎকার করে, উল্লাসে বলে উঠলেন, "বাহ্, এই তো আমার ভাইঝির মতো কথা বলেছিস। ঠিক বলেছিস, এ তো আমারই সম্মান রক্ষা করা।"

রুমি আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ওর সংকট কেবল কাকা কাকীমার অপমানকর সিদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ না। ওর দিদি সবিতা আর সমবয়সা বোন কবিতাও ওকে অপমান করতে ছাড়ে নি। কবিতা রীতিমতো ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে, চোখ ঘুরিয়ে বলেছে, "রমা, তুই এখন পাড়ার টপ হিরোইন। তোকে নিয়েই পাড়ার ছেলেরা এখন মেতে উঠেছে। কতো কিছুই যে জানিস।"

রুমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "কতো কী মানে?"

"কতো কী মানে হচ্ছে, ছেলে ভুলানো ছলাকলা।" কবিতা হেসে বিশ্রী ভঙ্গি করে বলেছে।

রুমি আহত বিস্ময়ে বলেছে, "আমি কেন ছলাকলা করতে যাবো কবিতা? যা করেছেন, কাকাই তো করেছেন।"

"তুই যে আবৃত্তি করতে পারিস, সে কথাও কি বাবা পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলতে গেছলেন?" কবিতা যেন সাপিনার মতো ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করেছে।

রুমি বলেছে, "কাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস, তাই তো তিনি বলেছেন।"

সবিতা মাঝখানে এসে, তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছে, "বাবা জানলেনই বা কী করে, তুই আবৃত্তি করতে পারিস?"

রুমি অসহায় বিস্ময়ে বলেছে, "তুমি কী বলছো সবিতাদি, আমি কাকাকে আবৃত্তি শোনাতে গেছি! আমি জানিও না, কাকা কবে লুকিয়ে আমার আবৃত্তি শুনেছেন, আর সে কথাই ছেলেদের গিয়ে বলেছেন।"

সবিতা ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলেছে, "একেই বলে ছলাকলা, বুঝলি রমা? ন্যাকামি করিসনে। বাবার দায় পড়ে নি, লুকিয়ে তোর আবৃত্তি শুনবেন। আসলে তুই-ই জেনে শুনে, না-জানার ভান করে বাবাকে শুনিয়েছিস।"

সবিতার কথার পিঠেই কবিতা বলে উঠেছে, "কই, আমরা যে এত আবৃত্তি করি, গান করি, কোনো দিন তো দেখি না, বাবা একবারও একটু দাঁড়িয়ে শুনছেন? তোর ও-সব চালাকি আমরা খুবই বুঝি, বুঝলি?"

রুমি জানতো, তর্ক বৃথা। আলোচনা নিরর্থক। ওর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ও বুঝেছে, সবিতা কবিতাকে ও কখনো, কোনো দিনই যথার্থ সত্যি কথাটি বোঝাতে পারবে না। কারণ ওরা অন্তর থেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না। অতএব, ওকে নিরস্ত হতে হয়েছে তর্ক থেকে, ম্লান হেসে বলতে হয়েছে, "তোমরা যদি এতটা বুঝে থাকো, তা হলে আমার কিছুই বলার নেই।"

"বলবার আবার তোর কী থাকবে ?" কবিতা ঝেঁজে উঠেছে।

রুমি জবাব না দিয়ে ওদের সামনে থেকে সরে গিয়েছে। পিছন থেকে সবিতা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আবৃত্তি করে হাততালি যদি পাস, তা হলেই ভালো। রূপ থাকলেই তো আর সব হয় না।"

সবিতার কথা একদিক থেকে যেমন সত্যি হবার সম্ভাবনা ছিল, তেমনি একটা অসম্ভবের সন্দেহও ছিল. আর সেই সন্দেহটাই রুমি প্রমাণ করে দিল, আটুই মে, ইয়ং মেন্‌স এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সন্ধ্যায়। ওর যে রূপ নিয়ে আর সকলের মাথা ব্যথা ছিল, রুমির নিজের সেই বিষয়ে কোনো অধিক চেতনা ছিল না। অতএব, ওর আত্মপ্রকাশের ভাবনাকে ও অনেকটা ধ্যানের মতো গ্রহণ করেছিল।

অনুষ্ঠানটা পাড়ার ব্যাপার হলেও, রুমির আবৃত্তি সবাইকে কেবল মুগ্ধই করলো না, অনেক বয়স্ক নরনারীর চোখের জল উপচে পড়লো। কে মেয়েটি ? বীরেন সেনের ভাইঝি, রমা সেন ? মুহূর্তেই পাড়ার মধ্যে রমা একটি নাম হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউ বুঝতে পারলো না, এর পরিণতি সুদূরপ্রসারী, এবং সূচনা করলো একটি ঝড়ের। যে ঝড়ের বেগে, রুমির জগৎটা হয়ে উঠলো বিস্তৃততর। সকলের প্রশংসার মধ্যে রুমির সব থেকে আনন্দ হলো অবনীশের প্রশংসায়, "রমা, তোমার যে আবার এ গুণটি ছিল, তা তো আমার জানা ছিল না!"

"গুণ না ছাই।" রুমি হেসে বলেছে. "তুমিও কি শুনতে গেছলে নাকি ?"

অবনীশ বলেছে, "গেছলাম বৈ কি। পাড়ার ছেলেরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করছে, একটা কার্ডও দিয়েছিল। অবিশ্যি আমি খুব একটা আশা নিয়ে যাই নি।"

"কিন্তু তুমি একেবারে মাত করে দিয়েছো। কার কাছে এমন সুন্দর আবৃত্তি শিখলে তুমি ?"

"কার কাছে আবার ?" রুমি বলেছে, "আমাকে শেখাবার কেউ নেই। নিজে নিজেই যা পারি, তাই করি।"

অবনীশ অবাক হয়ে বলেছে, "আশ্চর্য, আমার তো মনে হয়েছিল, কোনো নাম করা অভিনেতার কাছে শিখেছো। তোমার যদি আর একটু লেখাপড়া হতো, তা হলে তোমাকে আমি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে বলতাম।"

"তুমিই আমাকে শিখিয়ে দাও না অবনীশ।" রুমি বলেছে।

অবনীশ মাথা নেড়ে বলেছে, "আমি কি আবৃত্তি জানি নাকি ? ইংরেজি জানা থাকলে, তোমাকে একজনের কাছে নিয়ে যেতাম।" বলতে বলতেই তার ভুরু কুঁচকে উঠেছে, হঠাৎ যেন ধমকের সুরে বলেছে, "কী,—তুমি আবার আমার নাম ধরে ডাকলে ?"

রুমি খিলখিল করে হেসে বলেছে, "খেয়াল করো নি বুঝি ? আমি তো তোমাকে নাম ধরেই ডাকি।"

অবনীশ বলেছে, "বারণ করেছি না ? আমি তোমার থেকে কতো বড়ো জানো ?"

"হুঁ, জানি।" রুমি কৌতুকের হাসি হেসে বলেছে, "তুমি আমার থেকে চার বছরের বড়ো। তা বলে দাদা বলতে হবে কেন ?"

অবনীশ অবাক স্বরে বলেছে, "এই জন্য যে, আমি তোমার থেকে চার বছরের বড়ো।"

"চার বছরের বড়ো হলে বুঝি দাদা বলতে হয় ?" রুমি ঘাড় কাত করে বলেছে, "আমি তা মানি না। আমি তোমাকে প্রথম থেকে নাম ধরে ডেকে এসেছি, তাই ডাকবো। ভুলে যেও না, কয়েক বছর আগেও, ঠাকুরদের পোড়োয় আমরা একসঙ্গে গাদি খেলেছি।"

অবনীশ না হেসে পারে নি, বলেছে, "ঠিক আছে। তুমি এত ভালো আবৃত্তি করেছো, তোমার কথাই মেনে নিলাম।"

"সত্যি তোমার ভালো লেগেছে?" রুমি কিঞ্চিৎ দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করেছে।

অবনীশ অবাক স্বরে বলেছে, "আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি? তোমার আবৃত্তি অপূর্ব হয়েছে।"...

অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব! রুমির চারপাশে ধ্বনিত হতে লাগলো, আর ওর কাকা ওকে নিয়ে এক ক্লাব থেকে আর এক ক্লাবে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 'দেবতার গ্রাস'-এর পরে, পাড়ার উদয়াচল ক্লাবে, একটি ছেলের সঙ্গে ও আবৃত্তি করলো, 'বিদায় অভিশাপ।' দেবতার গ্রাসও যেন বিদায় অভিশাপের কাছে ম্লান হয়ে গেল। কাকার কাছে আর্জি আসতে লাগলো, ঘন ঘন স্থানান্তর থেকে। কাকাও সে সব আর্জি অনুমোদন করতে লাগলেন, কিন্তু কিসের বিনিময়ে, রুমি নিজেও তা জানতে পারলো না। আড়ালে আড়ালে কাকা টাকার বিনিময় শুরু করেছিলেন, সেই সঙ্গে আসা যাওয়ার খরচ, একটু ভালো খাওয়া, দামী সিগারেটের প্যাকেট।

বাড়িতে অশান্তি বাড়ছিল। কিন্তু কাকা কান দেন নি। রুমিও যেন নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছিল। কাকীমার অপমান, সবিতা, কবিতা, মধুদার কটূক্তি, কোনো কিছুই ওকে দমিত করতে পারে নি। ওর নিজের ভিতরে একটি অন্যায় কাজ করছে না। ও ওর আশেপাশে দেখেছে অনেক লোভাতুর দৃষ্টি, ঘনিষ্ঠ হবার অদম্য বাসনা। সে-সব ওকে স্পর্শ করে নি।

কিন্তু অবনীশ যেন একটু আপত্তির সুর তুলেছিল, "তোমার কাকা লোকটিকে তো চিনি। তোমাকে নিয়ে যে-ভাবে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।"

"কেন এ কথা বলছো?" রুমি জিজ্ঞেস করেছিল।

অবনীশ বলেছিল, "সবাই আজকাল তোমার আবৃত্তি করে বেড়ানোটা পেশাদারি বলে মনে করছে।"

"পেশাদারি?" রুমি অবোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল "তার মানে কী অবনীশ?"

অবনীশ ঈষৎ হেসে বলেছিল, "পেশাদারি মানে জানো না? পেশাদারি মানে টাকা নিয়ে আবৃত্তি করা।"

"কিন্তু আমি তো কোথাও টাকা নিই না!" রুমি অধিকতর বিস্ময়ে বলেছিল।

অবনীশ বলেছিল, "সেটাও আমি জানি, তুমি টাকা নাও না, কিন্তু তোমার কাকা নেন।"

"আমি তো সে-কথা জানি না।" রুমি সরল বিস্ময়ে বলেছিল।

অবনীশ বলেছিল, "আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু সবাই জানে, রমা সেনকে দিয়ে আজকাল আবৃত্তি করাতে হলে মোটামুটি ভালো টাকা দিতে হয়।"

রুমি এক মুহূর্ত চিন্তা করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "তাই যদি হয়, কাকার কি টাকা নেওয়াটা অন্যায়?"

অবনীশ রুমির কাছ থেকে ও রকম একটা প্রশ্ন আশা করে নি। সে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল, বলেছিল, "হয় তো অন্যায় নয়, কারণ তুমিই বা বিনা টাকায় সারা দেশে আবৃত্তি করে বেড়াবে কেন? আসলে আমি কী বলতে চাইছিলাম জানো? তুমি সত্যিই ভালো আবৃত্তি করো, কিন্তু এই আবৃত্তি নিয়েই কি তোমার সারাটা জীবন কাটবে রমা? সকলেরই ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে।"

"তুমি আমাকে কী করতে বলো?" রুমি জিজ্ঞেস করেছিল।

অবনীশ মাথা নেড়ে বলেছিল, "আমি তোমাকে কিছুই করতে বলতে পারি না। পাশাপাশি বাড়িতে থাকি, তুমি আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করো। একটা ব্যাপার তো বুঝি, সংসারে তুমি অনেকটা হেল্পলেস। তোমার খুড়তুতো বোনদের তবু বাবা মা আছে, তাদের একটা ভবিষ্যৎও আছে। কিন্তু তোমার কেউ নেই, তোমার কী ভবিষ্যৎ আছে?"

রুমির সেই মুহূর্তে, কাকার সেই টোপের কথা মনে পড়েছিল, কিন্তু অবনীশকে সে-কথা বলতে পারে নি। বরং ও অবনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল, ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে, অবনীশের মনে কোনো ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত আছে কী না। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, "আমার ভবিষ্যতের কথা কি তুমি ভাবো?"

অবনীশ যেন অপ্রস্তুত বিস্ময়ে বলেছিল, "আমি? আমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, কী আর করতে পারি রমা? তোমার ওপর আমার একটা সিমপ্যাথি আছে, তাই এ সব কথা বললাম।"

রুমির অবচেতন মনে কি একটা হতাশার গ্লানি বোধ জেগেছিল? কোনো দুঃখ বা অভিমান? সেটা ও ঠিক বুঝতে পারে নি, কিন্তু অবনীশের কথা শুনে, সহসাই যেন ওর মুখটা পলকের জন্য শক্ত হয়ে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলেছিল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবি না। যা আমার কপালে আছে, তাই ঘটবে। ভেবেই বা আমি কী করতে পারি। আর আবৃত্তি? আমার যতো দুঃখ অপমান, সব কিছুর হাত থেকে, আবৃত্তি করেই আমি সব ভুলে থাকি, শান্তি পাই। কিন্তু এই নিয়ে আমার সারা জীবন কাটবে কী না, তা আমি ভাবি না। ভাবতে চাইও না।"

অবনীশ ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, "তা হলে আমার কিছু বলার নেই। আর একটা কথা রমা, তোমার কাকা, তোমাকে কেন্দ্র করে, নানান্ ক্লাব আর কালচারাল ফাংশানগুলোতে, দলাদলি পাকিয়ে

তুলছেন। সেটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকারক, কারণ লোকে তোমার কথাই ভাবে, তোমার কাকার কথা না।"

"তাতেও কি আমার কিছু করার আছে অবনীশ।" রুমি খানিকটা অসহায় ভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল, এবং বলেছিল, "তুমি ভালোই জানো, এ সব ভেবে আমার কোনো লাভ নেই।" বলতে বলতে ও হঠাৎ একটু হেসে উঠেছিল, "এক এক সময় আমার কী মনে হয় জানো? বাবা মারা যাবার পরে, আমি যেন একটা চাকার মতো গড়িয়ে চলেছি। কোথায় গিয়ে যে থামবো, না কি ধাক্কা খেয়ে ছিটকেই পড়বো, নিজেই জানি না।"

এক যুগেরও আগে, রুমির মুখ থেকে ওর ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতিটা যেন দৈববাণীর মতোই উচ্চারিত হয়েছিল। ওর জীবনটা ঢালু জমিতে গড়িয়েই চলছিল, কিন্তু গড়িয়ে চলার বেগটা ছিল দুরন্ত আর অনিশ্চিত। সেই দুরন্ত আর অনিশ্চিত বেগের মধ্যেই একদা অবনীশ এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে, চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। আর কয়েক মাস পরেই, রুমির জীবনায়নের সেই দিনটি এসেছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ওর জীবনের দুরন্ত বেগে গড়িয়ে চলার সঙ্গে তাল রেখেই। কলকাতার এক মঞ্চগৃহে রুমি গিয়েছিল আবৃত্তি করতে। আবৃত্তি করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'ক্যামেলিয়া।' স্তব্ধ অডিটরিয়াম থেকে কয়েক মুহূর্ত কোনো শব্দই শোনা যায় নি। যেন এখনো শ্রোতৃবৃন্দ একটি অভাগী মেয়ের দুঃখে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই করতালিতে ফেটে পড়েছিল প্রেক্ষাগৃহ। আসল ঘটনাটা

ঘটেছিল তারপরেই। মঞ্চের উইংস্-এর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই, কাকা যেন ব্যাকুল খুশিতে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোকের সামনে। বলেছিলেন, "রুমা, ইনি বিখ্যাত কবরী পিকচার্স'-এর নাম করা ডিস্ট্রিবিউটার এ্যাণ্ড প্রডিউসার দ্বারকানাথ রায়। ওঁকে প্রণাম কর।"

রুমি দেখেছিল, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, তাঁর ধুতি পাঞ্জাবী আর হীরার বোতামে, ঐশ্বর্য আর বনেদীয়ানা ঝিলিক দিচ্ছিল। কাকার নির্দেশ, অতএব রুমি নত হয়ে দ্বারকানাথ রায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল।

দ্বারকানাথ অমায়িক কিন্তু বিব্রত ব্যস্ততার সঙ্গে রুমির হাত ধরে বলেছিলেন, "আহা, পায়ে হাত কেন? আসলে আমি তোমার আবৃত্তি শুনে কেবল মুগ্ধই হই নি, তুমি আমার বুকে মোচড় দিয়েছ। অপূর্ব! যেমন তোমার গলা, তেমনি উচ্চারণ, আর আবৃত্তির গুণে তুমি যেন ক্যামেলিয়া চরিত্রটির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলে!"

দ্বারকানাথ যখন এ সব কথা বলছিলেন, তখন আশেপাশে আরো অনেকেই রুমির দিকে মুগ্ধ চোখে দেখছিল। দ্বারকানাথ আবার বলেছিলেন, "সমস্ত কথাগুলোই যেন বেরিয়ে আসছিল তোমার প্রাণের ভেতর থেকে। একে বলে অভিনয়, কেবল আবৃত্তি নয়। কিন্তু কোনো পাকা অভিনেত্রীর পক্ষেও বোধ হয় এতটা সম্ভব নয়। সে হিসাবে তুমি একেবারে তাজা টাটকা পবিত্র ফুলের মতো। আমার নতুন ছবির জন্য তোমার মতো একটি মেয়েই আমাদের দরকার। তুমি একটা এ্যাসাইনমেণ্টে আসবে?"

প্রশংসায় দেব দেবীরাও খুশি হন। রুমি অষ্টাদশী বা ঊনবিংশ বয়সের তরুণী মানবী। প্রশস্তিতে খুশি হয়েছিল বৈকি। কিন্তু দ্বারকানাথের প্রস্তাবে ও কিছুই বলতে পারে নি। অবোধ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ছিল কাকার দিকে।

কাকা অতি উৎসাহে বলে উঠেছিলেন, "ও আবার কী বলবে? এ তো ওর পরম ভাগ্য! ও আমার ভাইঝি, আমার কথাই সব।"

দ্বারকানাথ সন্তুষ্ট হয়ে পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে, কাকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "বেশ, তা হলে শুভস্য শীঘ্রম্। আগামীকাল বেলা এগারোটায় ওকে নিয়ে আপনি আমাদের অফিসে আসবেন। আমি ডিরেক্টরকেও খবর দিয়ে রাখবো।"

রুমির নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু যাত্রাটা একেবারে নির্বিঘ্ন হতে পারে নি। রুপোলী জগতটার এমনই আকর্ষণ, এমনই মায়া, এমনই লোভাতুর হাতছানি, রাতারাতি কাকীমার চরিত্র পর্যন্ত বদলিয়ে গিয়েছিল। তিনি রুমিকে মাথায় করে রাখবেন না বুকে করে রাখবেন, ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। মধুদা সবিতা কবিতা—সকলেই রুমিকে নিজেদের বোন বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করছিল, যদিও গর্বের পাতলা পর্দাটার নীচেই ঈর্ষার বিষ উথলিয়ে উঠছিল।

রুমির কাছে সব থেকে সংকটজনক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন ওর কাকা। ওঁর দাবী, রুমি ওঁরই সৃষ্টি। রুমি সে-কথায় কোনো আপত্তি করে নি। কিন্তু সাপের মাথায় যেমন মণি থাকে, রুমি যেন কাকার সেই রকম একটি মহার্ঘ মণি হয়ে উঠেছিল। বিশাল অজগরের পাকে পাকে এবং হাঁ মুখের গ্রাসে, প্রতি পদে পদেই তিনি যেন রুমিকে আগলিয়ে রেখেছিলেন। রুমির নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু রইল না। ও কী ছবি করবে, কোন্ ভূমিকা করবে, কার সঙ্গে কী

কন্ট্রাক্ট সই করবে, টাকা পয়সার লেনদেন কী হবে না হবে, সবই কাকা তাঁর নিজের হাতে রেখেছিলেন। রুমি হয়ে উঠেছিল যেন কাকার হাতের একটি পুতুল, সমস্ত বিষয়ে কাকার মুখাপেক্ষী। মনের মতো একটা শাড়ি কিনতে হলেও, কাকার কাছে হাত পাততে হতো। কাকীমা বা দিদি বোনদের কিছু দিতে হলেও কাকার দ্বারস্থ হতে হতো। সবই নির্ভর করতো কাকার মর্জির ওপর।

কাকার চরিত্রেও পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। তিনি মদ্যপান শুরু করেছিলেন। কিছু কিছু অনাচারও বাদ যাচ্ছিল না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্বিনীত আর মদগর্বী। যার ফলে, বাড়িতে বিবাদ তো লেগেই ছিল, এমন কি সময়ে অসময়ে, রুমিকে অপমান করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না।

রুমির সঙ্গে কাকার সংঘর্ষ ক্রমে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ, স্বেচ্ছাচারিতা না, রুমির মধ্যেও আত্মচেতনাবোধ জাগছিল। ওর চারপাশের জগতকে দেখে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, ওর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ যেমন ঘটছিল, তেমনি জীবধর্মের যেটা সব থেকে বড় কথা, সেই আত্মরক্ষার চিন্তাও ওর মনে জাগছিল। ও হীনমন্যতা আর অপমান বোধ করছিল কাকার আচরণে। অথচ ওর চারপাশে যারা ছিল, কারো প্রতিই ভরসা করতে পারছিল না। কিন্তু নানা দিক থেকে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল।

এই রকম একটা অবস্থাতেই, অভিনয়ের সূত্রে, ও সুধাময়ীর সান্নিধ্য আর স্নেহ পেয়েছিল। তিনি তখন নায়িকা হিসাবে যদিও অস্তগামিনী কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিসীম। ছোট বড়ো, সকলের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়া। তিনিই প্রথম রুমিকে বলেছিলেন, "কিন্তু এ ভাবে চললে তো মা তোমার স্থিতিলাভও হবে না, শিল্পী জীবনটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

রুমি ব্যাকুল উদ্বেগে বলেছিল, "তুমি আমাকে বলো মা, আমি কী করবো?"

সুধাময়ীর দুই চোখে স্নিগ্ধ স্নেহমিশ্রিত বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, বলেছিলেন, "তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে?"

"তুমিও যে আমাকে মা বলেই ডাকলে?" রুমি আবেগের সঙ্গে বলেছিল।

সুধাময়ী বলেছিলেন, "বেশ, আজ থেকে তুই আমার মেয়ে, আমি তোর মা। আর মা হিসেবেই বলছি, তোকে তোর কাকার আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে।"

"কাকার আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে?" রুমি যেন বিস্ময়ে দিশাহারা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

সুধাময়ী দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ মা। তোর কথা থেকেই বুঝেছি, ও আশ্রয়টা পাপের। ওখানে থেকে তোর শুভ কিছু হবে না। সংসারকে তো দেখছিস। এবার তোর নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।"

"কী করে নেবো মা?" রুমি তেমনি দিশাহারা স্বরেই জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকা যে আমাকে তা নিতে দেবেন না।"

সুধাময়ী ভ্রূকুটি গাম্ভীর্যে বলেছিলেন, "কাকা তোর মালিক নন। তোর একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজের জোরে বাঁচবার অধিকার আছে। এমন কোনো আইন নেই, যাতে কাকা তোকে বেঁধে রাখতে পারেন। একটা কথা মনে রাখিস, যে-মেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে না, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। তা সে সংসারের পুরুষদের যতো দোষই দিক, আগে চাই তার নিজের রক্ষাকবচ।"

"কিন্তু মা, কাকার আশ্রয় ত্যাগ করে আমি কোথায় যাবো?" রুমি ব্যাকুল প্রত্যাশায় জিজ্ঞেস করেছিল, "আমি তো একলা কখনো থাকি নি।"

সুধাময়ী রুমিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "মা বলে যখন ডেকেছিস, তখন মায়ের আশ্রয়েই এসে প্রথমে উঠবি। তারপরে নিজের আশ্রয় গড়ে তুলতে তোর কোনো অসুবিধা হবে না। তোর

তো কোনো কিছুর অভাব নেই। নাম ডাক অর্থ, সবই আছে। তবে হ্যাঁ, মেয়েদের জীবনে একটি আশ্রয় চাই, যেখানে সে নারীর মূল্য পাবে।”……

এই মুহূর্তেই সহসা চিন্তার জাল ছিন্ন করে, নদীর বুক থেকে একটি তীব্র আলোর রেখা গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনের বুকে পড়ে, রুমি অবনীশের নিশ্চল পাথর মূর্তি দুটিকে উদ্ভাসিত করে দিল। নদীর বুক থেকে ভেসে এলো গম্ভীর শঙ্খনাদের মতো একটি শব্দ।

রুমি চকিত হয়ে উঠে সোজা হয়ে বসলো। অবনীশও স্টীয়ারিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়লো। রুমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “ওটা কী?”

“মনে হচ্ছে একটা জাহাজ, কলকাতা পোর্টের দিকে যাচ্ছে।” অবনীশ জবাব দিল, রুমির দিকে তাকিয়ে।

রুমি যেন সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে তাকিয়ে বললো, “এমন চমকে উঠেছিলাম! তুমি কী করছিলে বলো তো?”

“তুমি কী করছিলে, আমারও সেটাই জিজ্ঞাস্য।” অবনীশ হেসে জিজ্ঞেস করল।

রুমি বললো, “আমি যেন কোথায় হারিয়ে গেছলাম।”

“আমিও।” অবনীশ বললো।

রুমি জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় বলো তো?”

“তুমি কোথায় হারিয়ে গেছলে?” অবনীশ জিজ্ঞেস করলো, “দেখি, তোমার সঙ্গে আমার মেলে কী না?”

মোহনার বুকের জাহাজের তীব্র আলোর ছটা তখনো ওদের ওপর। আশেপাশে ফাঁকা, জনহীন। রুমি বললো, “তোমার মুখ থেকে পুরনো দিনের কথা শুনে, সেই দিনগুলোর মধ্যে হারিয়ে গেছলাম।”

“আমিও ঠিক তাই।” অবনীশ বললো।

রুমি বললো, “আশ্চর্য!” বলে হেসে উঠলো।

অবনীশও হাসলো। আলোটা ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে ওদের ওপর থেকে। আর একবার জাহাজ থেকে সেই গম্ভীর শঙ্খনাদ ভেসে এলো।

অবনীশ বললো, "সত্যি রমা, এখন বুঝতে পারছি, তোমার আজকের ট্যালেন্ট, অনেক কাল আগে সেই রেসিটেশনের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। তখন বুঝতে পারি নি, সেখান থেকে তুমি এখানে এসে পৌঁছুবে।"

রুমি বললো, "বুঝতে আমিই কি পেরেছিলাম?"

"অথচ আমি সেই সময়ে তোমার ব্যাপারে একটু ভয়ই পেয়ে গেছলাম।" অবনীশ বললো।

রুমি বললো, "সেটা আশ্চর্যের কিছু না। তোমার যা মনে হয়েছিল, তুমি তাই বলেছিলে। আর কাকার কথা তুমি যা বলেছিলে, তা তো মিথ্যে নয়। কাকাকে তো আমাকে বাধ্য হয়ে ছেড়ে আসতেই হয়েছিল।"

"এখন কি তাঁদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?" অবনীশ জিজ্ঞেস করলো, "আমি তো কোনো খবরই রাখি না।"

রুমি যেন একটু দ্বিধা করে বললো, "সম্পর্কের মধ্যে কাকীমা প্রতি মাসেই একবার আসেন। বুঝতেই পারো কেন আসেন। যতোটা পারি টাকা পয়সা দিই। সবিতাদি আর কবিতার বিয়ের খরচ সবটাই দিয়েছি। ওরাও মাঝে মাঝে টাকার জন্য চিঠি লেখে—" কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওর একটা নিঃশ্বাস পড়লো, বললে, "সম্পর্কটা এই পর্যন্তই।"

অবনীশ অবাক মুগ্ধ চোখে রুমির দিকে তাকিয়ে কেবল উচ্চারণ করলো "আশ্চর্য।"

"কী আশ্চর্য?" রুমি অবনীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

অবনীশের স্বরে আবেগ, "তুমি।"

রুমির চোখেও যেন চকিতের জন্য একবার আবেগের দ্যুতি ফুটলো। পরমুহূর্তেই একটু নড়েচড়ে উঠে বললো, "অবনীশ, এবার বোধ হয় আমাদের ফেরা উচিত। আমার বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছে।"

অবনীশ ব্যস্ত ভাবে গাড়ির সেল্‌ফ্‌-স্টার্টারে হাত দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, চলো।"

গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠলো। ইঞ্জিনের শব্দ তুলে মোড় নিয়ে গাড়ি ফিরে চললো।

রুমির বাড়ি। গেটম্যান যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। হেডলাইটের আলো দেখে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল। রুমি অবনীশকে বললো, "সোজা গিয়ে, বাঁদিকে গাড়িবারান্দা।"

অবনীশ নির্দেশ মতো সোজা গিয়ে, বাঁদিকে গাড়িবারান্দায় গাড়ি দাঁড় করালো। দরজার মাথায় আলো জ্বলছিল। রুমি দরজা খুলে নামবার আগেই দরজা খুলে গেল। আজ কলিংবেল টেপবার আর দরকার হলো না। খোলা দরজার সামনেই নমিতা আর সতীশ দাঁড়িয়ে ছিল। রুমি বুঝতে পারলো, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে, ওর জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষা করছে। অন্য দিক থেকে তেজসিং গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। রুমি বললো, "অবনীশ. তুমি নেমে এসো, তেজসিং গাড়ি গ্যারেজ করে দেবে।"

অবনীশ গাড়ি থেকে নেমে রুমির কাছে দাঁড়ালো। রুমি সিঁড়িতে পা দিয়ে ডাকলো, "এসো

তারপর নমিতা সতীশের দিকে তাকিয়ে ওর মুখে ফুটে উঠলো কিঞ্চিৎ বিব্রত অপরাধের হাসি, বললো, "তোমরা খুব ভাবছিলে তো? এক জায়গায় একটু আটকে পড়েছিলাম।"

নমিতা আর সতীশ দুজনেই দরজার দু'পাশে সরে দাঁড়ালো। সতীশ গম্ভীর মুখে বললো, "যেখানেই আটকে যান, একটা টেলিফোন করবেন তো।"

রুমি দেখলো, নমিতার মুখও গম্ভীর, কিন্তু দু'চোখে উদ্বেগ। রুমি হেসে হাত জোড় করে বললো, "এবারের মতো তোমাদের দিদিমণিকে মাফ করে দাও। আর এ রকম হবে না।"

"হাত জোড় করে আর আমাদের অপরাধী কোরো না।" নমিতা বললো, "ভেতরে চলো।"

রুমি মুখ ফিরিয়ে অবনীশের দিকে তাকিয়ে হেসে ডাকলো, "এসো অবনীশ।"

অবনীশ সুদীর্ঘ ঢাকা বারান্দা দিয়ে রুমির পাশে চলতে চলতে নীচু স্বরে বললো, "এরা দেখছি তোমার গার্জিয়ান।"

"তার থেকেও বেশি বলতে পারো।" রুমিও স্বর নামিয়ে বললো, "ওরা আমাকে ভালোবাসে।"

ইতিমধ্যে সতীশ কাছাকাছি এসে বললো, "দিদিমণি, মিঃ গাঙ্গুলি টেলিফোন করেছিলেন। তিনি মায়ের বাড়িতে টেলিফোন করে আপনাকে পান নি। মা-ও ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করেছিলেন, বলেছেন, আপনি ফিরে এলেই যেন মাকে একটা টেলিফোন করেন, যতো রাতই হোক।"

মা মানে সুধাময়ী। রুমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, "এই রে, আমার আজ পালানোটা দেখছি সকলের জানাজানি হয়ে গেছে।" ও অবনীশের দিকে ফিরে বললো, "অবনীশ, তুমি ঘরে যাও। একটু যদি বাথরুম-টাথরুমে যেতে চাও, ঘুরে এসো, আমি ততক্ষণে মাকে একটা টেলিফোন করি। তা নইলে সারা রাত মা ঘুমোবে না।"

অবনীশ একটু বিব্রত অস্বস্তিতে বললো, "রমা, রাত কম হলো না, আমি বরং এবার ফিরে যাই।"

"ইস্! তোমার মাথা খারাপ নাকি? যতো রাতই হোক, তুমি খেয়ে যাবে। কলকাতায় এই রাত আবার রাত নাকি?" বলে সতীশের দিকে ফিরে বললো, "সতীশ, তুমি দাদাবাবুকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যাও। যে-কোনো ঘরে ওঁকে নিয়ে যেতে পারো।"

সতীশ অবনীশকে সমীহ করে ডাকলো, "আসুন।"

অবনীশ দেখলো, বারান্দারই এক কোণে টেলিফোনের রিসিভার তুলে, রুমি ততোক্ষণে ডায়াল করতে শুরু করে দিয়েছে। অগত্যা তাকে সতাশের সঙ্গে ভিতরে যেতেই হলো।

রুমি প্রথম সুযোগেই একেবারে সুধাময়ীকে টেলিফোনে পেয়ে গেল। ওর স্বর শুনেই, তারের ওপার থেকে সুধাময়ীর উদ্বেগ-ব্যাকুল স্বর শোনা গেল, "কোথায় গেছিলি তুই? তুই তো কখনো এ রকম বাইরে যাস না, এত রাতও করিস না?"

রুমির চোখে মুখে আবার সেই বিব্রত অপরাধের হাসি, বললো, "শোন মা, তোমাকে না জানিয়ে যাওয়াটা আমার ভুল হয়েছে। তা হলে মিঃ গাঙ্গুলি ব্যাপারটা জানতে পারতেন না।"

ওপার থেকে সুধাময়ীর কৌতূহলিত অবাক স্বর ভেসে এলো, "মিঃ গাঙ্গুলিই তো আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন. তুই আমার কাছে এসেছিস কী না। তোর সঙ্গে নাকি কে একটা ছেলে ছিল? কে সে? আমি চিনি?"

রুমি হেসে বললো, "না, তুমি চেনো না। যার কথা বলছো, তার নাম অবনীশ চ্যাটার্জি, আমার ছেলেবেলার চেনা। ওর সঙ্গে আজ আমি প্রোজেকশন দেখে, ডায়মণ্ড হারবারের দিকে চলে গেছলাম।"

ওপার থেকে সুধাময়ীর স্বর ভেসে এলো, "তা ছাড়া, সতীশের মুখে শুনলাম, তোর ড্রাইভার তেজসিংকে ছেড়ে দিয়ে তুই সেই ছেলেটার সঙ্গে চলে গেছিস্।"

রুমির মুখে লজ্জার ছটা লাগলো, বললো, "তা গেছি। অবনীশ নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গেছলো।"

ওপার থেকে সুধাময়ীর স্বরে কিঞ্চিৎ কৌতুক ফুটলো, "যাক, অবনীশের সঙ্গে একলা যেতে তা হলে তোর ভরসা ছিল। তবে তো ছেলেটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আলাপ করতেই হয়।"

রুমি যেন সলজ্জ আহুরে স্বরে বললো, "উঁ, মা, তুমি ও রকম করে বলবে না।"

সুধাময়ীর হাসি শোনা গেল, "আচ্ছা বলবো না। সে এখন কোথায়? চলে গেছে?"

"না, ওকে আমি আটকেছি। খাইয়ে তবে ছেড়ে দেবো।" রুমি বললো।

সুধাময়ীর স্বর "তা হলে আর তোকে আটকাবো না। তোরা খাওয়া দাওয়া কর। কাল তোর শুটিং নেই, আমার আছে। আমি শুটিং-এর পর তোর কাছে ঘুরে আসবো।"

"সেই ভালো।" রুমি বললো, "কিংবা আমিও কাল সন্ধেয় তোমার বাড়ি যেতে পারি।"

সুধাময়ীর স্বর, "বেশ তো, তাই আসিস। অবনীশকেও সঙ্গে নিয়ে আসিস।"

"চেষ্টা করবো।" রুমি বললো।

সুধাময়ীর কপট গাম্ভীর্যের স্বর ভেসে এলো, "চেষ্টা নয়, এটা আমার আদেশ।"

রুমি খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, "আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি ওকে বলবো।"

সুধাময়ীর স্বর, "বেশ, যা তোরা খেয়ে নে, এখন ছাড়লাম।"

ওপার থেকে টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। রুমি আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ওর অন্যমনস্ক মুখে একটা হাসির আচ্ছন্নতা। পরমুহূর্তেই ওর চোখে পড়লো, ডাইনিং রুমের দরজার

কাছে খানসামা সুধীর দাঁড়িয়ে আছে। রুমি ব্যস্ত ভাবে বললো, "সুধীর, টেবিলে খাবার দিয়ে দাও।" বলে ও মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সতীশ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য পাশে নমিতা। ও জিজ্ঞেস করলো, "দাদাবাবু কোথায় ?"

সতীশ বললো, "ভেতরে গেছেন।"

রুমি দ্রুত পায়ে প্রথম ঘরটিতে ঢুকলো। সেখানে অবনীশ ছিল না। ও পাশের ঘরে ঢুকলো। এ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজার দিকে তাকালো। কিঞ্চিৎ ফাঁক দেখে বুঝলো, ভিতরে কেউ নেই। রুমি একটু অবাক হলো, ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভেবে, পর্দা সরিয়ে তৃতীয় ঘরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। দেখলো, অবনীশ রুমির সেই স্বপ্নের ঘরটির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ভিতরের দিকে দেখছে। ও আস্তে আস্তে অবনীশের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অবনীশ রুমির অঙ্গরাগের সুবাসে, দ্রুত পিছন ফিরে তাকালো। রুমি দেখলো, অবনীশের চোখে মুখে অপরিসীম বিস্ময়, অথচ গাম্ভীর্যের ভার। সে আবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে, যুগল শয্যা ও ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখলো। দেখলো দেয়ালের মা ও সন্তানের পেইন্টিং-এর প্রিন্ট। তারপরে রুমির দিকে ফিরে, অবাক গম্ভীর স্বরে বললো, "তোমার এ জীবনের খবরটা তো বলো নি ?"

রুমি ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ জীবনের ?"

"তোমার এই ঘরের জীবন ?" অবনীশ বললো, "তোমার স্বামী সন্তান……এদের কথা কই একবারও বলো নি তো আমায় ? তা তোমার কর্তাটি কোথায় ?" বলতে বলতে তার ঠোঁট যেন বিদ্রুপে বেঁকে উঠলো।

রুমি অবনীশের ঠোঁটের বক্রতা লক্ষ্য করলো, "কর্তা ? সে কে ?"

"কেন, তোমার স্বামী ?" অবনীশের স্বরে বৈরাগ্য ও ব্যঙ্গ।

রুমি বললো, "জানি না তো সে কোথায় ?"

অবনীশের ভুরু কুঁচকে উঠলো, "মানে ?"

"মানে সত্যি জানি না।" রুমি অবনীশের অবাক ও হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

অবনীশকে চিন্তিত দেখালো, সে কিছু বলতে পারলো না। দুজনেই দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো। তারপরে রুমি অবনীশের পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে, পিছন ফিরে ডাকলো, "ভেতরে এসো।"

"থাক্ না" অবনীশ বললো।

রুমির ঠোঁটে করুণ হাসি, "অন্তত আমার সন্তানটিকে একবার দেখে যাও।"

অবনীশ অবাক, কিন্তু যেন সম্মোহিতের মতো ঘরের ভিতরে ঢুকলো। রুমিকে অনুসরণ করে, দাঁড়ালো গিয়ে বিছানার ধারে। রুমি শিশুর পাশে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলো, মুখ নামিয়ে তার গালে ঠোঁট ছোঁয়ালো। তারপর আস্তে আস্তে পুতুলের গায়ের ঢাকনা সরিয়ে দিল, যেন অবনীশের চোখের পর্দাও খুলে দিল।

অবনীশ পুতুলটি দেখে, বিস্মিত চমকে ডেকে উঠলো, "রমা!"

রুমি কোনো জবাব দিল না, ফিরে তাকালোও না। অতি সন্তর্পণে যেন ঘুমন্ত শিশুর গায়ে হাত বোলাবার মতো, পুতুলের গালে গাল চাপলো, ওর ঠোঁট নড়ে উঠলো।

অবনীশ আবার স্খলিত স্বরে ডাকলো, "রমা!"

রুমি ফিসফিস্ করে বললো, "অবনীশ, আমার সন্তানকে ছাখো।" ওর চোখের কোণে জল।

অবনীশের মধ্যে অস্থির ব্যাকুলতা দেখা দিল। ও আস্তে নীচু হয়ে রুমির কাঁধে হাত রেখে বললো "রমা, আমি না জেনে হয় তো তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে তুমি বুঝিয়ে বলো।"

রুমির স্বর রুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো, "অবনীশ, এ সবই আমার স্বপ্ন। আমার প্রাণের সাধকে এমনি করে সাজিয়ে রেখেছি।

বলতে পারো, এ স্বপ্ন ইচ্ছে হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার মনের মাঝারে। বাস্তবে সবই শূন্য। এ ঘর আমার আকাঙ্খার ছবি।"

অবনীশ ওর দীর্ঘ দেহ নিয়ে, রুমির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। রুমির চিবুকে হাত দিয়ে, তার নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো, 'রমা, অনেক কাল পরে আজ তোমাকে মাত্র দ্বিতীয়বার দেখছি। আমি বুঝতে পারি নি। তখন তোমাকে বলেছিলাম, আশ্চর্য! এখন বলছি, তুমি আকাশের দূরের নক্ষত্রের মতো অসামান্য বিস্ময়।"

"কেবল বিস্ময়? আমি কি কেবলই বিস্ময়!" রুমি রুদ্ধ স্বরে বললো।

অবনীশ বললো, "না। তুমি সেই বিস্ময়, যেখানে অনেক জিজ্ঞাসা. অনেক ব্যথা।"

"অবনীশ!" রুমি স্খলিত স্বরে ডাকলো, আর ওর চিবুক ধরা অবনীশের হাতে উদ্গত কান্নাকে চেপে ধরলো।

রুমি সেনের জীবন, নতুন পরিবর্তনের ধারায় আবর্তিত হলো। আর তা নিয়ে রুপোলী জগৎ আর পত্রিকা মহলে চললো নানান্ জল্পনা কল্পনা। এখন যেখানে রুমি, সেখানেই অবনীশ। অবনীশ রুমির সঙ্গে, স্টুডিওর ইনডোর ফ্লোরে, আউটডোর শুটিং-এ, তাছাড়া দুজনের অবকাশ যাপনের আউটিং তো আছেই।

দ্বিতীয় রাত্রের ঘটনার পরের দিন সন্ধ্যাতেই, রুমি অবনীশকে নিয়ে গিয়েছিল সুধাময়ীর বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অবনীশের। অবনীশ সুধাময়ীকে প্রণাম করে বলেছে, "আমি অতি সামান্য মানুষ। রুমির পাগলামিতে আপনার কাছে আমি এসেছি।"

"রুমির পাগলামিতে নয় বাবা, আমিই তোমাকে দেখতে চেয়েছি।" সুধাময়ী অবনীশের চিবুকে হাত দিয়ে ঠোঁটে ছুঁয়ে বলেছেন, "আর পাগলামি বলছো, সংসারে খাঁটি পাগলামির বড়ো অভাব। ভণ্ড পাগলে যে দেশটা ছেয়ে রয়েছে। আর আমার মেয়ের পাগলামির কথা বলছো? ও সত্যি পাগল।"

অবনীশ বলেছে, "আপনি আপনার মেয়েকে পাগল বলতে পারেন। ওকে আমি বারো-তেরো বছর বয়সে দেখেছি। পাগল ভাবি নি, কিন্তু কষ্ট হতো।"

রুমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছে, "জানো মা, কষ্ট হতো বলেই, বলা নেই, কওয়া নেই, অবনীশ হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল।"

"ও রকম করে বোলো না রমা।" অবনীশ যেন আবেগে অনুরোধ করেছে, "তুমি আমাদের বাড়ির কথা জানতে। পাশ করার পর দাদারা চান নি, আমি আর একদিনও তাঁদের অন্ন ধ্বংস করি। আমাকে বাধ্য হয়েই চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল।"

সুধাময়ী বলে উঠেছেন, "সেটাই তো পুরুষের ধর্ম বাবা। আত্মসম্মান বোধ আর স্বনির্ভর হওয়াটাই পুরুষের কাজ।"

রুমি ঘাড় কাত করে বলেছে, "ইস্, মা তুমি যে অবনীশের পক্ষে চলে যাচ্ছো।"

সুধাময়ী হেসেছেন, "এর আবার পক্ষে বিপক্ষে কী, যা সত্যি তাই বললাম।"

অবনীশ বলেছে, "কিন্তু রমার সামনেই বলছি, ওর জন্য সব সময়ে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কাকার বাড়িতে ওর জীবনটা যে-ভাবে কাটছিল, বুঝতে পারতাম না, কী ওর ভবিষ্যৎ।"

সুধাময়ী বলেছেন, "তুমি যে মেয়েটার জন্য এতটুকুও ভেবেছো, তার জন্য তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।"

পরে রুমি অবনীশকে বলেছে, "অবনীশ, কাকার বাড়িতে আমার লাঞ্ছনায় তুমি যে কষ্ট পেতে, আমি তা জানতাম। এখন তো বলতে কোনো বাধা নেই। সেই সময়ে মনে হতো, তুমি ছাড়া আমার মনের কথা কেউ বোঝে না।"

"কিন্তু তখন আমি জানতাম না, সেই তুমি, এই তুমি হবে।" অবনীশ বলেছে।

রুমি ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "এ কথা বললে কেন? আমি কি তা বলেছি?"

"না তুমি বলো নি, আমিই বলছি।" অবনীশ অপ্রস্তুত হেসে বলেছে, "আজকের লোকেরা কথাটা শুনলে অন্য ভাবে নিতে পারে। পারে না?"

রুমি বলেছে, "হয় তো পারে। কিন্তু আমার মা মোটেই সে-ভাবে নেন নি।"

"ওঁর তো কোনো তুলনাই হয় না।" অবনীশ বলেছে।

রুমি বলেছে, "আমি জানি অবনীশ, সিঁথিতে কাকার বাড়িতে থাকার সময়ে, আমার জন্য তোমার দুশ্চিন্তার মধ্যে কোনো স্বার্থই ছিল না। আমার মনে আছে, আবৃত্তি করে বেড়াবার দিনগুলোতে, তোমার মন সায় দেয় নি, তুমি আপত্তি করেছিলে সেদিন। আমার ক্ষতির কথা ভেবেই তুমি সে-কথা বলেছিলে। কিন্তু—" রুমি হঠাৎ থেমে গিয়েছে।

অবনীশ অনুসন্ধিৎসু হয়েছে, "কিন্তু? বলো, থামলে কেন রমা?"

"কিন্তু, আমার জন্য, তোমার ঠিক সেই মনটা কি আজো আছে?" রুমি অবনীশের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

অবনীশ বলেছে, "রমা, সেটা আজ প্রমাণ করা বড় কঠিন।"

"কেন, কঠিন কেন?" রুমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

অবনীশ ম্লান হেসে, অথচ আবেগের সঙ্গে বলেছে, "আমি বললেই বা সে কথা বিশ্বাস করছে কে ?"

"আমি। আমি তো তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা ভাবতে পারি না অবনীশ।" রুমির চোখে ঔৎসুক্য গভীর হয়েছে।

অবনীশ একটু চুপ করে থেকে বলেছে, "রমা, আমি যদি বলি, তোমার এত নাম খ্যাতি জানবার পরেও আমার মনের অবস্থা অবিকল আগের মতোই ছিল, তা হলে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু সেদিন রাত্রে, তোমার বিশেষ সেই ঘরটিতে গিয়ে দেখেছি, তোমার প্রতি আমার সেই আগের মনটাই রয়ে গিয়েছে।"

রুমি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি, একটা গভীর আবেগমিশ্রিত অনুসন্ধিৎসায় অবনীশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আর অবনীশ আবেগ-বিষণ্ণ স্বরে বলেছে, "রমা, সেই ঘরটায় ঢুকে বুঝতে পারলাম, ঐশ্বর্যের মহারাণী তুমি, কতো মৌমাছি তোমাকে ঘিরে রয়েছে। অথচ যার চাক ভরা মধু, সেই মক্ষীরাণীর প্রাণে কি গভীর হাহাকার। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সিঁথির মেয়েটি, যে-কাকা কাকীর বাড়িতে বড় অসহায় জীবন কাটাচ্ছে।"

অবনীশের কথাগুলো শুনতে শুনতে, রুমির শূন্য প্রাণটা যুগপৎ বেদনায় ও আনন্দে ভরে উঠেছে। ও অবনীশের একটা হাত নিজের গালে চেপে ধরে বলেছে, "অবনীশ, এখন বুঝতে পারছো, প্রোজেকশন দেখতে গিয়ে, মায়া নামে সেই মেয়েটির কথা তোমাকে কী বলেছিলাম? বলেছিলাম, আমিও যেন ওই মেয়েটির মতোই, আজো পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি।"

অবনীশ যেন করুণ আবেগে রুমিকে নিজের ঘন সান্নিধ্যে টেনে নিয়ে বলেছে, "মনে আছে রমা, মনে আছে। তখন তোমার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। এখন আর অবাক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, বাইরে থেকে আমরা একটা মানুষের কিছুই বুঝতে পারি না, তাকে চিনতে পারি না।"

"এখন তো বুঝতে পারছো অবনীশ ? এখন তো চিনতে পারছো ?" রুমি যেন আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করেছে।

অবনীশ বলেছে, "চিনতে পারছি বই কি রমা। পারছি, আর পারছি বলেই মনে হচ্ছে, তোমার ভেতরটাকে না দেখতে পেলেই বোধ হয় ছিল ভালো।"

"কেন অবনীশ, এ কথা বলছো কেন ?" রুমি যেন উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছে।

অবনীশ বলেছে, "আমি এক চালচুলোহীন মানুষ। তোমার ভেতরটা দেখতে পেয়ে, আমার বুকে জমে থাকবে একটা বোবা ব্যথা। তার বেশি আমি আর কী করতে পারবো ?"

"শুধু বোবা ব্যথা জমে থাকবে ?" রুমির স্বর যুগপৎ প্রত্যাশায় ও অভিমানে গাঢ় হয়ে উঠেছে, "তোমার বোবা ব্যথা কি আমাকে প্রকাশ করতে পারো না ?"

অবনীশ সহসা কোনো জবাব দিতে পারে নি, রুমির অনিন্দ্য রূপ সুষমার মধ্যে যে এক অসহায় নারী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেই দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

রুমি অবনীশের বুকের জামা হাত দিয়ে টেনে, প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলেছে, "সেই সিঁথির দুর্ভাগা মেয়েটাকে আগের মতোই দেখতে পারো না তুমি ? তখন না হয় মনের কষ্ট চেপে রাখতে, এখনো কি তার দরকার আছে ?"

অবনীশ আবেগ রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠেছে, "রমা !"

রুমির চোখের জলের বিন্দু চিকচিক করে উঠেছে, বলেছে, "তোমাকে আর কী করে বলবো, আমি বড়ো একা, বড়ো একা ! আজো যখন একলা বিছানায় শুয়ে চোখ বুজি, তখন তোমার মুখ[illegible]নে পড়ে যায়, যে আমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে একটু ভালোবাসতো, [illegible] করতো। অবনীশ—" ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

অবনীশ রুমিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছে, "রমা, তোমার একাকীত্ব ঘোচাতে পারলে, আমি সব থেকে সুখী হবো।"

রুমি সেন গভীর আবেগে আবেশে এবং একটা নির্ভরতায়, মাথা নুইয়ে দিয়েছে অবনীশের বুকে।

পাহাড়ের পাদদেশে, শীতের বিশীর্ণ নদীটিকে, ক্ষীণ ধারায় বইতে দেখলে, বোঝা যায় না, বর্ষার ঢল নামলে সে কেমন দু'কূল ছাপিয়ে ভরে ওঠে, ছুটে চলে দুরন্ত বেগে। অবনীশকে ঘিরে রুমির জীবনের আবর্তনের ধারাটা বহে চলেছে তেমনি বেগে। এই দুরন্ত বেগের একটা বৈশিষ্ট্য, তখন ছোটোখাটো কোনো কিছুর প্রতি তার নজর থাকে না। তখন সে একবগ্‌গা ছুটে চলে কেবল সাগর সঙ্গমের আশায়। রুমির অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম। ওর মনে একটা সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন অবিচল ওর গতি। দৃষ্টির সীমানায়, আশেপাশে কোথায় কী ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে, কোথাও কোনো সর্বনাশের ইঙ্গিত রয়েছে কী না, কোনো কিছুই ওর চোখে পড়লো না। কারণ মানুষের অন্তরে যা সব থেকে বড় সম্পদ, সেই 'বিশ্বাস' ওকে চালিত করছে। অবিশ্বাস সন্দেহ মানুষকে হীন করে, দুর্বল করে। সংসারে যার 'বিশ্বাস' নামক শক্তিটি নেই, সে কখনো মন প্রাণ সঁপতে পারে না। 'বিশ্বাস' এমন একটি শক্তি, যা মানুষের মরণকে ডেকে আনলেও, সেই শক্তির মহত্ব কখনো ক্ষয় হয় না। রুমির মনে এখন সেই শক্তিটি প্রবল। বিশ্বাস হারানো পাপ, জীবনকে যতো জটিলতা আর সন্দেহই ঘিরে থাকুক। বিশ্বাসই ঘুচিয়ে দেয় সকল সংকোচ আর বিহ্বলতা।

রুমি টেনে খুলে দিয়েছে অবনীশের জীর্ণ পুরানো বেশবাস। নতুন করে সাজিয়েছে তাকে। লোকে এটাকে অর্থকৌলীন্য ভেবে ভুল করে। আসলে এটাও একটা সৌন্দর্যবোধ, শিল্পীর কারুমিতি। ও হানা দিয়েছে অবনীশের ধর্মতলার আস্তানায়। চারতলা বাড়িটার ছোট ছোট খুপরি ঘরগুলোতে অজস্র রকমের ব্যবসা ও বাসিন্দাদের আবাস। হেতুড়ে ডাক্তার, অচল দুর্ভাগা পাবলিসিটির ডেরা, টাইপ-রাইটিং আর শর্টহ্যাণ্ড শেখার ইস্কুল, তার মধ্যেই বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু-মুসলমান পরিবারের স্ত্রীলোক আর শিশুরা ঘুরে বেড়ায়। সিঁড়িতে রাজ্যের জঞ্জাল জমানো, চারিদিকে দুর্গন্ধ। তারই মধ্যে আলো বাতাস হীন একটি খুপরীতে অবনীশের বাস।

রুমি সেখানে গিয়ে দেখেছে, জেলখানার লোহার খাটের মতো একটা খাট, মলিন তার শয্যা। একপাশে টি-সেট সাজানো একটি ড্রাফটস্‌ম্যানের টেবিল, উঁচু টুল। পেন্সিল, সেট স্কোয়ার, কম্পাস, স্কেল, ব্লু-প্রিন্টের তাগাড় ছড়ানো ছিটানো। একটা র‍্যাকে জামা কাপড় ঝোলানো। নড়াচড়ার জায়গা নেই।

রুমি কাতর অনুরোধ করেছে, "অবনীশ, এ ঘর তোমাকে ছাড়তে হবে।"

"ছেড়ে কোথায় যাবো?" অবনীশ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করেছে।

রুমি বলেছে, "মনে কোরো না, দুঃখের জীবন কাকে বলে আমি ভুলে গেছি। সেটা মনে রেখেই বলছি, তোমাকে যেতে হবে রমার বাড়িতে।"

"ওরে বাপ্‌রে!" অবনীশ যেন ভয়ে বলে উঠেছে, "বাড়িওয়ালা শুনলে এখুনি আমাকে কোতল করে দেবে। মাসে আশি টাকা ভাড়া, সাত মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে।"

রুমি খিল খিল করে হেসে উঠেছে, "হায় মডার্ণ আর্কিটেক্ট, এই অন্ধকার গুহারও ভাড়া জমেছে? ঠিক আছে। বাকি পড়া ভাড়ার টাকাটা আমি তোমাকে ধার দেবো।"

"ধার? শুধবো কী করে?" অবনীশ কপট উদ্বেগে জিজ্ঞেস করেছে।

রুমি চোখের তারা ঘুরিয়ে বলেছে, "যতো দিন শোধ না করতে পারো, ততোদিন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়বে।"

"তারপর?"

"তাতেও যদি শোধ না করতে পারো, তা হলে একটা মুচলেকা লিখে দিলেই হবে।"

"কী রকম? জীবন-সত্ব বেগার খাটা?"

"আজ্ঞে না। সেবিকা রুমি সেনের যাবজ্জীবন দায়দায়িত্ব।"

অবনীশ চোখ কপালে তুলে বলেছে, "সর্বনাশ! সে যোগ্যতা আমার কোথায়?"

"যোগ্যতার মাপকাঠির বিচার আমি—" রুমি থেমে গিয়ে ঈষৎ হেসে বলেছে, "মহাকালের হাতে সঁপে দেবো।"

"বড় কঠিন ব্যাপার।" অবিনাশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলেছে।

"কঠিন ব্যাপার সহজ করার সমাধানটা আমিই করবো।" রুমি বলেছে, "কিন্তু আর একদণ্ডও তোমাকে তিলে তিলে পচতে দেওয়া হবে না।"

"আর আমার এই সব আসবাবপত্র?"

রুমি জবাবে, লোহার খাট থেকে উল্টে ফেলে দিয়েছে বিছানা। র‍্যাকে ঝোলানো ময়লা জামাকাপড় দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিয়েছে। কাজের টেবিলটায় হাত দিতে যেতেই, অবনীশ প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে, "ওটা নয়, ওটা নয়। ওটা হলো ছুতোরের করাত, চাষীর লাঙ্গল, রাঁধুনির হাতা খুন্তি।"

"মানে মডার্ণ আর্কিটেক্টের হাতিয়ার।" রুমি বলেছে, "ঠিক আছে এ ঘর থেকে কেবল এই টেবিলটাই তোমার সঙ্গে যাবে।"

অবনীশ কিছুটা দ্বিধা করে বলেছে, "কিন্তু সইবে কী?"

"না সইবার কারণ কিছু নেই।" রুমি বলেছে।

অবনীশ বলেছে, "রুমি সেন আমার থেকে ভালো জানে, লোকের জিভের বড় ধার।"

"রুমি সেন এও জানে, সেই ধারের কোনো ভার নেই।" রুমি বলেছে, "পরনিন্দা আর পরচর্চা যারা করে, তাদের আর যা-ই থাক, ভেতরটা আগুনে পোড়া ছাই।"

অবনীশ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, "আগুন?"

"হাঁা, যার আর এক নাম মাৎসর্য, মানে ঈর্ষা।" রুমি বলেছে।

অতএব অবনীশকে তার চামচিকের খুপরিটা ছাড়তেই হয়েছে। কিন্তু রুমির বাড়িতে সরাসরি না, আপাততঃ মধ্য কলকাতার এক মাল্‌টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এর ফ্ল্যাটে সে উঠেছে।

কিন্তু লোকের বিষয়ে অবনীশ যেমন ভুল বলে নি, রুমির বক্তব্যও আদৌ মিথ্যা নয়। রুমি সেনের নামে কেবল নিন্দাবাদই শুরু হয় নি, জল্পনা কল্পনা আর কেচ্ছাকাহিনী হার মানিয়ে দিল আরব্য-উপন্যাসকে। গল্পের গরু সত্যিই গাছে উঠলো।

একটি ফিল্ম জার্নালে রুমির ছবি বেরোলো, যার পিছনেই অবনীশের ফটোকে দেখানো একটি বৃহৎ ছায়ামূর্তির মতো। নীচে লেখা আছে—"রুমি সেনের পিছনে নূতন ছায়া। ছায়াটি রাহু না মঙ্গল?" একটি নাম করা কাগজে ছাপা হলো, "চিত্রজগৎ থেকে রুমি সেনের বিদায় আসন্ন, এ খবর পাওয়া গিয়েছে বিশ্বস্ত সূত্রে। বর্তমানে তিনি যে ছবিটি করছেন, এটিই তাঁর শেষ ছবি। বাকি সমস্ত

চুক্তি তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ একটিই, সুপার স্টারের নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ লেগেছে। তবে কে জল ঘোলা করছেন, সে-বিষয়ে নানান্ চাঞ্চল্যকর সব নাম শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, ভারতীয় চিত্রজগতের এক দিকপালের সহধর্মিনী হতে চলেছেন তিনি। কারো কারো অনুমান, এক চালচুলোহীন বেকারের গলায় নাকি তিনি মালা পরাতে যাচ্ছেন। একেবারে খাঁটি সিনেমার গল্প।"

আর একটি কাগজে মিঃ গাঙ্গুলির ভাই, 'আর্কিটেক্ট এ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়র রমেন গাঙ্গুলী'র একটি সাক্ষাৎকার ছেপে বেরলো। রমেন গাঙ্গুলি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, অবনীশ চ্যাটার্জি তার ফার্মে যুক্ত ছিল বটে। কিন্তু সে একটি অকর্মার ঢেঁকি। স্থাপত্যের বিদ্যাটি তার যথার্থ অধিগত নয় বলেই, সে উদ্ভট সব কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছিল, যে-কারণে, কলকাতা বা বম্বে বা দিল্লি, কোথাও পাত্তা পায়নি। তবে তার একটা প্রতিভা স্বীকার করতেই হবে, রুমি সেনের মতো অদ্বিতীয়া চিত্রাভি-নেত্রীর জগতে সে মাথা গলাতে পেরেছে। এ রকম একটা অশুভ ব্যাপার কল্পনাই করা যায় না।

রুমি বুঝলো, এটি প্রযোজক মিঃ গাঙ্গুলিরই একটি চাল। কারণ তিনি নানা ভাবে রুমিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, অবনীশের সাহচর্যটা ওর পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু অবনীশ রমেন গাঙ্গুলির সাক্ষাৎকার পড়ে রেগে আগুন হয়ে উঠলো। বিশেষ করে তার আর্কিওলজির জ্ঞান সম্পর্কে কটাক্ষ করার জন্য। সে তীব্র ভাষায় একটা প্রতিবাদ লিখে ফেললো সেই কাগজে পাঠাবার জন্য।

রুমি হাসতে হাসতে প্রতিবাদ-পত্রটি নিজের হাতে নিয়ে বললো, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওরা তো এটাই চাইছে। এই রকম একটা চিঠি দেওয়ার মানে, জেনে শুনে ওদের ফাঁদে পা দেওয়া। এ সব যতো গায়ে মাখবে, ততো ওরা তোমাকে পেয়ে বসবে! ওদের কাদা ছোড়বার সুবিধে হবে। এগুলোকে একদম পাত্তা দেবে না।"...

তথাপি নানা রকম পরস্পর-বিরোধী আর সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে নানা রকম খবর বেরোতে লাগল। তার মধ্যে রুমির নামের সঙ্গে জড়ানো হলো অনেক মহারথীদের। অথচ সেই সব মহারথীরা কোনো প্রতিবাদ করলেন না। রুমি বুঝতে পারলো, সেই সব মহারথীদের প্ররোচনা কাজ করছে। কিন্তু যখনই কেউ রুমির কাছে কিছু জানবার জন্য ছুটে এলো, ও এমন একটা তুষ্ণীম্ভাব বজায় রাখলো, যা থেকে সত্যি মিথ্যা কিছুই বোঝা গেল না।

কেউ কেউ সুধাময়ীর মারফৎ রুমিকে উপদেশ বর্ষণ করলো। সুধাময়ী ব্যঙ্গ হেসে, সে-সব কথা রুমিকে জানালেন। অবনীশের সঙ্গে রুমির অতীত প্রেম কাহিনীর আজগুবি গল্প ছড়ালো। শেষ পর্যন্ত এমন গল্পও ছড়ালো যে, রুমির অতীতেই নাকি একটি সন্তান হয়েছিল, সন্তানের জনকের নাম 'শ্রীচট্টোপাধ্যায়।'

আজে বাজে টেলিফোন আসার তো অন্ত ছিল না। সেক্রেটারি মিস দাস রীতিমতো উত্তেজিত। অদ্ভুত সব চিঠি আর টেলিফোনে বেচারি একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে রুমির কাছে দাবী করলো, কোনো কোনো সিনেমা পত্রিকা আর ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবার জন্য।

রুমি নিজে মর্মাহত হলেও, মিস দাসকে বললো, "মিস দাস, এ-সব করে তারা, যারা যে-ভাবেই হোক লাইমলাইটে আসতে চায়। আমার তার দরকার নেই। আর প্রভোক্ড হয়ে কিছু করা মানে, ওদের হাতের পুতুল হওয়া। তাতে কাজ নষ্ট, মনের শান্তিটুকুও যাবে। ওদের নাচতে দিন, হাঁফিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগবে না।"

রুমি কথাটা মিথ্যা বলে নি, যদিও অন্য পক্ষের হাঁপিয়ে পড়াটা তেমন সহজ ব্যাপার না। কিন্তু অন্য দিকে আর একটা ব্যাপার ঘটছিল অদৃশ্যে। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, প্রকৃত সাধককে সজাগ থাকতে হবে, এবং জানতে হবে, অনেকে কেবল বেশভূষায় সাধু। কিন্তু 'অলিগর্দ' অর্থাৎ ভয়ংকর সরীসৃপসমূহ, সুন্দর ভূমিস্তরের গভীরে

বিচরণ করছে। সাধকের অন্তরের গভীরে সেই কামনার সরীসৃপকে সাধনার দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।

রুমি ওর একবগ্‌গা গতির ধারায়, অবনীশের চোখের দিকে তাকিয়ে, তার হৃদয়ের অন্ধকার দিকটাকে দেখতে পেল না। ওর ঐশ্বর্য আর প্রতিষ্ঠার দিকে, অবনীশের সতর্ক লুব্ধ দৃষ্টিটা রয়ে গেল ওর আবেগের আড়ালে। অবনীশের হাতে অনায়াস টাকা, সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে বাস, পোশাকে আশাকের পরিবর্তন, রুমি সেনের ক্ষমতার কিছু অংশ প্রাপ্তি, এই প্রাথমিক সুযোগগুলো তাকে হাতছানি দিচ্ছিল এক সর্বগ্রাসী লোভের দিকে। সে তার ভাষাকে করলো অধিক মায়াময়, স্বরের আবেগকে করলো গাঢ়তর এবং প্রস্তাবনার প্রথম সূত্রপাতে, সুযোগ এবং সময় বুঝে, একদিন বললো, "রমা, আমার এই জীবনটা, কেমন যেন নিরর্থক লাগছে।"

"কেন অবনীশ?" রুমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "নিরর্থক কেন?"

অবনীশ বললো, "তোমার জীবনে আমার ভূমিকা কি?"

"সে-কথা কি এখনো বুঝতে পারো নি?" রুমি বিস্ময়ে না হেসে পারলো না। "রুমির জীবনে তোমার ভূমিকা, তুমিই তার সব, সর্বস্ব। এ-কথা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে অবনীশ?"

অবনীশ বিষণ্ণ হেসে বলেছে, "তা বুঝতে পারি, পারি না শুধু আমার অধিকারের সীমাটা মাপতে।"

"তোমার অধিকারের সীমা?" রুমি যেন বিস্মিত চিন্তায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো, তারপরেই হেসে বললো, "আমার জীবনে তোমার অধিকারের কোনো সীমা নেই অবনীশ। আমি আমার সবকিছুই তুলে দেবো তোমার হাতে। আমার নিজের বলে কিছুই রাখতে চাই না আমি।"

অবনীশ মুখে কিছু বললো না, কিন্তু মুখে তার ফুটে রইলো একটা বিষণ্ণ হতাশা। রুমির চোখে সেটা ফাঁকি গেল না। কয়েক দিনের

মধ্যেই, ও ওর সলিসিটরকে ডেকে বাড়ি গাড়ি সবই অবনীশের নামে লিখে দিতে চাইলো।

অবাক সলিসিটর জানতে চাইলেন, কিসের ভিত্তিতে এই দিতে চাওয়া? গিফট্ অথবা সেল্?

রুমি বললো, "গিফট্।"

সলিসিটর বললেন, "যাকে যে-সম্পত্তিই গিফট্ করুন, তার ইনকাম ট্যাক্স কিন্তু আপনাকেই বহন করতে হবে।"

রুমি বললো, "নিশ্চয়ই তা করবো।"

রাতারাতি রুমির প্রায় যাবতীয় সম্পত্তি, গিফট্ হিসাবে অবনীশের নামে দলিল হয়ে গেল। সেই দলিল যখন রুমি অবনীশের হাতে তুলে দিল, সে অবাক হলো। খুলে পড়ে বললো, "এ কি করেছো তুমি রমা? না না, এ হতে পারে না। তোমার সব কিছু আমি এভাবে গ্রহণ করতে পারি না।"

"করতে হবে অবনীশ।" রুমি করুণ হেসে বললো, "এ আমার সাধ। আমার বাইরের যা কিছু, আগে সব নাও, তোমার শেষ গ্রহণের জন্য সিঁথির সেই মেয়েটা হাত বাড়িয়েই আছে।"

কিন্তু রুমি বলতে পারলো না, "আমাকে গ্রহণ করো, ফুলে ফলে আমার জীবনকে সার্থক করো অবনীশ, তারপরে আমার সব কিছুই নাও।" বরং ও ভাবলো, অবনীশের মনের সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, অবনীশকে অদেয় ওর কিছুই নেই।

সুধাময়ী যখন ঘটনাটা জানতে পারলেন, মোটেই স্বস্তি বোধ করলেন না। রুমিকে বললেন, "সাত তাড়াতাড়ি এমন একটা কাজ করতে গেলি কেন?"

রুমি বললো, "মা, আমার মনে হলো, অবনীশকে ওর অধিকারের সীমারেখাটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত। ও যেন না ভাবে, ওকে অদেয় আমার কিছু আছে।"

সুধাময়ী বললেন, "তা বুঝলাম, কিন্তু তারও তো একটা সময় আছে।" বলে একটু হাসলেন, "ছেলেকে যৌতুক দিতে হলেও, তার আগে আশীর্বাদটা তো সেরে নিতে হয় ?"

রুমি বললো, "আমি সে-রকম করে কিছু ভাবতে শিখি নি মা। আমার মন যা চেয়েছে আমি তাই করেছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।"

সুধাময়ী রুমিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছেন, "তোকে আবার আমি নতুন করে কী আশীর্বাদ করবো মা। তবে অন্তরের তাগিদে যখন কাজটা করেছিস, আমি আর কিছু বলতে চাই না।"

কিন্তু অবনীশ সেখানেই ক্ষান্ত হতে পারলো না। ওর আচরণের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন দেখা গেলেও, রুমির চোখে তা তেমন করে পড়লো না। রুমির বাড়িতে অবনীশের যাতায়াত বাড়লো। সে সেক্রেটারি মিস দাস থেকে, দাসী ভৃত্য খানসামা পাচক, সবাইকে বুঝিয়ে দিল, সে-বাড়িতে তার কর্তৃত্বটাই আসল। তার জীবনের যে-দিকগুলো ছিল অপূরণীয় অথচ বিশেষ আকাঙ্ক্ষার, সে-সব প্রাণ খুলে করলো। রুমিকে নিয়েই ও হোটেলে গেল খানা খেতে, ক্যাবারে নাচের আসরে। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মদ্যপান করলো কিঞ্চিৎ।

রুমির কাছে এ সব অস্বাভাবিক মনে হলো না। বরং সাথীর অভাবে ও কলকাতার বুকেও জীবনটাকে এতদিন ঠিক ভোগ করে উঠতে পারে নি। কারণ, ও ইতিপূর্বে কারো সঙ্গেই একাকী, নির্দ্বিধায় আর অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে নি কোথাও। অবনীশকে সুখী দেখেই ও সুখী।

এই অবস্থাতেই অবনীশ রুমির কাছে প্রস্তাব করলো, এখন থেকে রুমির বিজনেস্ এ্যাফেয়ারগুলো সে নিজেই দেখাশোনা করবে। কারণ সে চায় না, ও সব নিয়ে রুমি আদৌ মাথা ঘামায়। তা ছাড়া, সব কাজ সেক্রেটারি আর সলিসিটরদের দিয়ে হয় না, নিজের একজন লোক দরকার।

অবনীশ এমন ভাবে প্রস্তাবটা করলো, রুমির কাছে একটুও অস্বাভাবিক মনে হলো না। ও সব কিছুর অধিকারই লিখিত ভাবে অবনীশের হাতে তুলে দিল। দেবার সময় বললো, "অবনীশ, এক সময়ে কাকা আমার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চেয়েছিলেন। মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে অনেক দিন নিজের বোঝা নিজেই টেনে বয়ে বেড়াচ্ছি। আজ তুমি আমাকে মুক্তি দিলে।" ও একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

রুমির মুক্তি? আসলে ও যে ক্রমে ক্রমে অজগরের কঠিন পাকের কুণ্ডলীতে বাঁধা পড়ছিল, তা বুঝতে পারলো না। ওর বিশ্বাসের অবিচলতা, দৃষ্টিকে কতোখানি আছন্ন করে রেখেছে, নিজেও তা টের পেল না। পারলে, দেখতে পেতো, চির অভুক্ত অজগরটা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, এবার মুখ ব্যাদান করে, ওকেই সমূলে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। ভালোবাসা আর বিশ্বাস যখন কার্যকারণ যুক্তিগুলো হারিয়ে ফেলে, তখনই এ রকমটা ঘটে।

রুমি অবনীশের চরিত্রের অনেকটাই জানতো না। সিঁথির সেই স্বল্পবাক্ তরুণটি, জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে, কোণঠাসা হয়ে, সমস্ত সংসারের প্রতি বিদ্বেষে আর ঘৃণায় জ্বলছিল। রুমির জন্মদিনে সে একটা সুযোগ নিয়েছিল, যদি কোনো ক্রমে রুমির সঙ্গে পরিচয়টা হয়। কিন্তু পরিচয় হওয়া মানে, এতটা প্রত্যাশা সে নিজেও কখনো করে নি। সে ছিল পরাজিত, জীবনে কিছুই ভোগ করতে পারে নি।

রুমি সেনের সকল বিত্ত আর বৈভব নিজের করায়ত্ত দেখে, তার লোভের মাত্রা হয়ে উঠলো অতি আগ্রাসী ও উগ্রতর। এই শ্রেণীর চরিত্রে যে ভালোবাসার স্থান নেই, রুমি তা বিচার করতে পারলো না। সর্বনাশের শেষ ধাপে এসে, রুমি মুখোমুখি হলো অন্য এক অবনীশের। চিরযৌবনা উর্বশী, রুপোলী পর্দার অক্ষত নক্ষত্র দেখলো, ওর সামনে দাঁড়িয়ে এক কামার্ত পুরুষ ওকে বাহুবলে গ্রাস করতে চাইছে।

আসন্ন এক সন্ধ্যায়, সারাদিন ইনডোর শুটিং-এর পরে বাড়ি ফিরে রুমি অবনীশের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ওর অপেক্ষা ব্যর্থ হলো না, অবনীশ এলো। কিন্তু অন্য অবনীশ।

অবনীশকে দেখেই বোঝা গেল, সে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। চোখ আরক্ত, নিশ্বাসে মদের গন্ধ। রুমি মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হলেও, হেসে বললো, "কী ব্যাপার? সন্ধ্যের মধ্যেই এত খেয়ে এসেছো?"

"কী নিয়ে থাকি বলো?" অবনীশের স্বর যেন কিঞ্চিৎ গোঙানো, "কিছু তো একটা করতে হবে।" সে রুমির পাশেই বসলো।

রুমি বললো, "ইদানিং কিন্তু তুমি একটু বেশি খাচ্ছো।"

অবনীশ রুমির গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "তার জন্য দায়ী তো তুমিই।"

রুমি বারান্দায় সোফায় বসে ছিল। স্বভাবতই দাসী ভৃত্যদের সামনে, অবনীশের গলা জড়িয়ে ধরাতে অস্বস্তি বোধ করলো। ও অবনীশের হাত ছাড়িয়ে, অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "আমিই দায়ী? কী রকম?"

অবনীশ জবাব দেবার আগে, আবার রুমির গলা জড়িয়ে ধরে, ওকে বুকের ওপর টেনে নেবার চেষ্টা করে বললো, "নয়? তুমি কি ভেবেছো আমি একটা কাঠের পুতুল? রক্ত মাংসের মানুষ নই? আমার আর কোনো দাবী থাকতে পারে না?"

রুমি দেখেছে, ইতিপূর্বেও অবনীশ ওকে কাছে টেনে আলিঙ্গন করেছে। চুম্বনে উদ্যত হয়েছে। রুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু

ব্যাপারটাকে খুব অস্বাভাবিক মনে করে নি। ও জানে, অবনীশ কী চায়। অবনীশকে ওর অদেয় কিছুই নেই, তথাপি অবনীশের এই চাওয়াটার মধ্যে, একটি অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, অবনীশ নিজেই সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবে। অথচ অবনীশ কখনো সে-কথা নিজের মুখে একবারও উচ্চারণ করে না। বরং ও অবাক ও আহত হলো অবনীশের কথা শুনে। অবনীশ ইতিপূর্বে, ঠিক এই ভাষায় আর কখনো কথা বলে নি।

রুমি কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত চোখে আশেপাশে একবার দেখে, ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "অবনীশ, এ সব কথাবার্তা এখানে চলতে পারে না। তুমি ঘরে এসো।" বলেই ও দ্রুত পায়ে বারান্দার মোড় ঘুরে, বাঁদিকের প্রথম ঘরটিতে ঢুকলো।

অবনীশও উঠলো, এবং শক্ত স্বরে বললো, "আমিও তাই চাই।" সে রুমির পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

রুমিই প্রথমে অবাক ব্যথিত স্বরে বললো, "অবনীশ, কে বললো, আমি তোমাকে রক্তমাংসের মানুষ ভাবি না? আর আমি কেনই বা ভাববো, যে আমার কাছে তোমার আর কোনো দাবী থাকতে পারে না?"

"তবে কেন তুমি আমার কাছ থেকে সরে থাকো? কেন আমাকে ধরা দাও না?" বলতে বলতেই সে যেন একটি ক্ষিপ্ত বরাহের মতো রুমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওকে বুকের ওপর পিষে ধরলো, "আমি কী চাই, তা কি তুমি বোঝো না? আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, তোমাকে আজ কিছুতেই ছাড়বো না।" বলে ওকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

রুমি অবনীশের কাছ থেকে ঠিক এমন আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই প্রথম ওর চোখের দৃষ্টিতে সংশয় আর সন্দেহ দেখা দিল। ও নিজেকে প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করে বললো, "শোনো, অবনীশ, আমার একটা কথা শোনো।"

"না, তোমার কোনো কথাই আমি আর শুনতে চাই না।" অবনীশ মত্ত স্বরে বললো, "তুমি আমাকে তোমার সব কিছু দিতে পারো, আর তোমাকে দিতে পারো না?" বলে রুমিকে বিছানায় লুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলো।

রুমি কঠিন প্রয়াসে, অবনীশকে ধাক্কা দিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ক্ষোভে দুঃখে ওর সমস্ত মুখ রক্তাভায় ঝলকিয়ে উঠেছে। ও ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, "না, নিজেকে দিতে পারি না। সব দিতে পারি, কিন্তু নিজেকে না। কেন পারি না, তা কি তুমি বোঝো না?"

"না, আমি বুঝি না।" অবনীশ দুর্বিনীত স্বরে বললো।

রুমির রক্তাভ মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটলো, বললো, "কেন অবনীশ? তুমি কি সামাজিক জীব নও?"

"এই যুগে সমাজের আবার কী আছে? সে-সব ছিল বাপ-ঠাকুরর্দার আমলে।"

"বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়, তবে জিজ্ঞেস করি, তুমি আমাকে কী ভাবো?"

"কেন, একজন শ্রেষ্ঠ তারকা!"

"আমি—আমি তোমার কাছে একজন শ্রেষ্ঠ তারকা?" রুমির চোখে মুখে আহত যন্ত্রনা।

"কিন্তু নারীও ভাবি।"

"তাই যদি ভাবো, তার স্বীকৃতি কি তুমি আমাকে দিয়েছো?"

"স্বীকৃতি? সেটা কী?"

"সেটা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া, তুমি আমাকে কোন্ হিসাবে পেতে চাও?"

অবনীশ হা হা করে হেসে উঠলো। রুমি এবার তীব্র স্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "অবনীশ, এভাবে হেসো না। সবকিছুর একটা মাত্রা থাকা চাই।"

অবনীশ হাসি থামিয়ে বললো, "মাত্রা? বেশ! স্বীকৃতি বলতে তুমি তাহলে বিয়ের কথা বলতে চাইছো?"

রুমি তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, "তোমার মতো শিক্ষিত লোকের তা বোঝা উচিত।"

"তার মানে, তুমি আমাকে বোঝাতে চাইছো, চিত্রতারকা রুমি সেন এতকাল অক্ষতযোনি কুমারীটি রয়ে গিয়েছে?" অবনীশের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি, "এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? সতীত্ব?"

রুমিও এবার পরিবেশ ভুলে, স্ফূরিত স্বরে গর্জে উঠলো, "অবনীশ, সাবধান! কাকে কী বলছো ভেবে দেখো।" ওর চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলে উঠলো।

মত্ত দুর্বিনীত অবনীশ সহসাই যেন একটা নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাকালো রুমির দিকে। রুমি তাকিয়ে ছিল ওর চোখে চোখ রেখে। অবনীশ যেন সেই চোখে চোখ রাখতে পারলো না। আস্তে আস্তে তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো একটা বিষণ্ণ অসহায়তা। নিস্তেজ হয়ে গেল তার মত্ততা। করুণ স্বরে ডাকলো, "রমা—"

রুমি কোনো জবাব দিল না, কিন্তু অবনীশের প্রতি দৃষ্টি ওর শূন্য হয়ে গেল। যেন ডুবে যাচ্ছে নিজের মধ্যে। অবনীশ আবার করুণ স্বরে বললো, "রমা, আমাকে ক্ষমা করো। আমার মাথার ঠিক নেই, কী বলতে কী বলেছি।"

রুমি কোনো জবাব দিল না। ওর চোখ বুজে গেল, আর চোখের কোণে বড়ো বড়ো ফোঁটায় টলটল করে উঠলো অশ্রুবিন্দু। বুকের গভীর যন্ত্রণাকে দু'হাত দিয়ে চাপা দিল।

অবনীশ পায়ে পায়ে রুমির কাছে এগিয়ে গেল, জানু পেতে বসলো ওর পায়ের কাছে। ওর হাঁটু স্পর্শ করে বললো, "রমা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

রুমি যেন কেঁপে উঠলো, আর ওর মুখে ফুটে উঠলো তীব্র যন্ত্রণা। রুদ্ধ স্বরে বললো, "আজ পর্যন্ত যে অপমানটা আমাকে কেউ করতে

পারে নি, তুমি তাই করলে। তুমি—তুমি—।" ওর স্বর কান্নায় ডুবে গেল।

"ক্ষমা করো, ক্ষমা করো রমা।" অবনীশ তার গাল চেপে ধরলো রুমির হাঁটুর কাছে, বললো, "আর কখনো বলবো না। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।"

রুমির দু' চোখের কোণ থেকে জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, এবং বুকে রাখা একটি হাত আস্তে আস্তে নেমে এলো অবনীশের মাথায়।

কিন্তু আসলে এই ঘটনাটাই সর্বনাশের শুরু। রুমি মনে মনে অবনীশকে ক্ষমা করলেও, ভিতরে কোথায় যেন একটা চিড় খেয়ে গিয়েছে। ও তো সহজে স্বচ্ছন্দে এই জীবনে উত্তীর্ণ হয়নি। পশ্চাতে রয়ে গিয়েছে অনেক অপমান লাঞ্ছনা। তাই যুদ্ধের ঘোড়া যেমন বিপদের গন্ধ পায় ওর অবচেতনেও যেন সেই রকম একটা বিপদের সঙ্কেত থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে। যদিও ও প্রাণপণে অবনীশকে বিশ্বাস করতে চাইলো, সহজ হতে চাইলো, আর সেই কারণেই আবার বুঝতে ভুল করলো, অবনীশের ক্ষমা চাওয়াটা ছলনা মাত্র। তার প্রতিজ্ঞা একটা ধূর্ত ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই না।

অবনীশ যে-কথা একবার মুখ ফুটে বলেছে, রুমির সম্পর্কে সেটাই ওর বদ্ধমূল ধারণা ও বিশ্বাস। তার ক্ষমা চাওয়াটা আসলে পাকা সেনাপতির মতো সাময়িক পশ্চাদ্ধাবন মাত্র। তারপরেই তার প্রথম পদক্ষেপ হলো, রুমির সেক্রেটারী মিস দাসকে বরখাস্ত করা। রুমির কাছে কৈফিয়ৎ হিসাবে সে বললো, এখন থেকে সে নিজেই সেক্রেটারীর কাজ চালাবে এবং মিস দাসের টেবিলে বসবে। অকারণ মাইনে গোণার মানে হয় না।

রুমি বিষয়টা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারলো না, কিন্তু প্রতিবাদও করলো না। অথচ খেয়াল করলো না মিস দাসকে তাড়ানোর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য। নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে সারাদিনই রুমির বাড়িতে

অবস্থানের ব্যবস্থা করে নিল অবনীশ। তা ছাড়াও, রুমির ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, কাগজ, সবকিছুই সে যাতে নিজের হাতে রাখতে পারে সেটাও তার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য।

রুমি কেবল বললো, "অবনীশ, তোমার কোনো কাজেই বাধা দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। শুধু একটি অনুরোধ, তোমার আমার মাঝখানে যে ফাঁকটা আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেটা সম্পূর্ণ করো।"

"তুমি বিয়ের কথা বলছো তো?" অবনীশ হেসে বললো, "ভেবো না, সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বাড়িতে এনে সব কাজ করবো।"

রুমি বললো, "সেটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেল। এখন এই জীবনটা সব সময় আমার কাছে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করছে।"

"কাঁটার মতো?"

"হ্যাঁ, অপমানের কাঁটা।" রুমি বললো, "তুমি কি বুঝতে পারো না?"

অবনীশ হেসে বললো, "রমা, তুমি ভারি সেন্টিমেন্টাল। রুপোলী পর্দার সুপার স্টার হয়েও, মডার্ণ ওয়ে অফ লাইফটা তুমি চিনতে শেখো নি।"

রুমি বললো, "তোমার মডার্ণ ওয়ে অফ লাইফটা কী, আমার তা জানতে ইচ্ছে করে না। কেবল মনে রেখো, আমি সেই সিঁথির মেয়েটিই আছি।"

"অর্থাৎ সিঁথিতে সিঁদুর পরা চাই-ই।" অবনীশ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসতে গিয়েও, নিজেকে সামলে নিল।

রুমি বললো, "তা বলতে পারো। আমি সুপার স্টার হই, আর যা-ই হই, মনে মনে আমি এক সাধারণ মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নই। দেশের সব মেয়েরাই যেমন চায়, সংসার স্বামী সন্তান, আমিও তাই চাই। তার জন্য সব কিছুই আমি ছাড়তে রাজী আছি।"

অবনীশ বললো, "দেশের সব মেয়েরাই এমনটি চায়, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

রুমি দৃঢ় স্বরে বললো, "যারা চায় না, তারা হয়তো অসাধারণ, কিন্তু অবনীশ, তাদের আমি বুঝতে চাই না। জীবনে আমি কিছু কম দেখি নি, তবু আমি সেই সাধারণের দলে। আমি রুমি সেন হয়েও, তাদেরই একজন থাকতে চাই।"

"সুপার স্টার রুমি সেনের মুখে কথাটা মানায় না রমা।"

"তাই নাকি?" রুমি ঘাড় কাত করে অবনীশের চোখের দিকে তাকালো, "আমার মুখে কী মানায়, তোমার কাছেই শুনি।"

অবনীশ যেন কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বললো, "না—মানে—আমি বলতে চাইছিলাম, তুমি কেন সমাজের পরোয়া করবে। সমাজের লাখ লাখ মানুষ তোমার পেছনে ছুটবে।"

"তার মানে তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী হতে বলছো?" রুমি ধারালো নীচু স্বরে বললো, "ভেবেছো, আজ যারা টাকা নাম আর প্রতিপত্তির জোরে জগতটাকে তুড়ি মেরে ওড়াচ্ছে, নিজের সুখের জন্য সব ন্যায় অন্যায় বোধ জলাঞ্জলি দিচ্ছে, আমি তাদের একজন?" বলতে বলতে ওর ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো, "তোমাকে দোষ দেবো না অবনীশ, আমাদের জগতের একটা অংশকে দেখে, তোমার হয়তো এই বিশ্বাসই জন্মেছে। কিন্তু মনে রেখো, আমি সে-দলের নই।"

অবনীশ রুমির অভিব্যক্তি বুঝতে তিল মাত্র দেরি করলো না, হেসে হাল্‌কা ভাবে বললো, "তুমি সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছো নাকি? আমি কিন্তু নেহাতই তর্কের খাতিরে কথাগুলো বললাম। আসলে তুমি যা বলেছো, ঠিকই বলেছো।"

রুমির চোখে মুখে এলো অন্যমনস্কতা, ও যেন একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে, দৃঢ় কঠিন স্বরে বললো, "তুমি যে-কোনো কারণেই বলতে পারো, আমি কিন্তু চিরদিন অন্য স্বপ্ন দেখে এসেছি। যে-স্বপ্নকে আমি

মন্দিরের মতো সাজিয়ে রেখেছি আমারই এক ঘরে। অবনীশ, আমি বড়ো আশায় বুক বেঁধেছি। তুমি আমার সেই স্বপ্নকে সার্থক করো। আমাকে নারীত্বের মর্যাদা দাও।" শেষ মুহূর্তে ওর গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো।

রুমির কথাগুলো শুনতে শুনতে, আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে অবনীশও যেন স্থির থাকতে পারলো না। রুমির কাছে গিয়ে, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে, কোমল স্বরে বললো, "রমা, আমি কখনোই তোমার অমর্যাদা করতে পারবো না।"

রুমির চোখের কোণে জলের বিন্দু। ও ওর কাঁধে রাখা অবনীশের হাতের ওপর নিজের একটি হাত রাখলো, ঠোঁটে ম্লান হাসি, চোখে প্রত্যাশার দৃষ্টি।

কয়েকদিনের মধ্যেই অবনীশের মনে হলো, মাঝবয়সী শক্ত সমর্থ সতীশ নামে পুরনো ভৃত্যটিকে যেন ও সহ্য করতে পারছে না। লোকটার আচরণের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, প্রত্যেকটি আদেশ নির্দেশই যথাযথ পালন করে। তথাপি অবনীশের মনে হয়, তার প্রতিটি কাজের বিরুদ্ধেই যেন সতীশের একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন থাকে। কথাটা মনে হতেই, সামান্য ত্রুটির অছিলায়, রুমির অবর্তমানে, সে সতীশকে বরখাস্ত করে দিল।

রুমি সারাদিন শুটিং সেরে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। কিন্তু

ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে সঠিক ধরতে পারলো না সে। স্টুডিও থেকে ফিরে ও ওর প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী আগে স্নান করলো। হেয়ার ড্রায়ারে চুল শুকালো। তারপর লুঙ্গির সঙ্গে একটা ঢিলে জামা পরে বারান্দায় সোফায় বসে, সতীশকে ডাকলো।

সামনে এসে দাঁড়ালো নমিতা। নমিতার মুখ নত। রুমি অবাক হয়ে বললো, "তুই এলি কেন, আমি তো সতীশকে ডাকলাম। ওকে একবার ডিজাইনার্স শপে যেতে হবে।"

নমিতা তথাপি দাঁড়িয়ে রইলো। রুমি মুখ ফেরাতে গিয়ে, আবার ভুরু কুঁচকে, কিছুটা বিরক্ত স্বরে বললো, "কী হলো, আমার কথা শুনতে পেলি না?"

নমিতা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, "দিদিমণি, সতীশদাদা চলে গেছে।"

"সতীশ চলে গেছে!" রুমি অবাক হয়ে নমিতার দিকে তাকালো, তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলো, খানসামা সুধীর আর পাচক গৌরাঙ্গ বিষণ্ণ নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। রুমি নমিতার দিকে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সতীশ চলে গেছে মানে কী? কোথায় গেল, কেন গেল?"

নমিতা কান্না ভরা স্বরে বললো, "দাদাবাবু আজ সতীশদাদাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।"

"চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে! সতীশকে?" রুমি যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, বললো, "কেন? সতীশ কী অপরাধ করেছে?"

নমিতা মাথা নেড়ে কেঁদে বললো, "তা জানি না দিদিমণি।"

রুমির মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললো, "না না, এ হতে পারে না।" বলেই ও উঠে গিয়ে, বারান্দায় রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে, বাড়িরই আর একটা নাম্বারে টেলিফোন করলো। ওর অফিস ঘরের টেবিলে যে টেলিফোন থাকে। ডায়াল করতেই ওপার থেকে অবনীশের স্বর শোনা গেল, "ইয়েস।"

"আমি রুমি বলছি। একবারটি ওপরে আসতে পারবে?" রুমি বললো।

অবনীশ জবাব দিল, "যাচ্ছি।"

রুমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে, বারান্দায় অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

সুধীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "দিদিমণি, চা দেবো?"

"না, কিছু চাই না।" রুমি গম্ভীর চাপা স্বরে বললো।

সুদীর্ঘ বারান্দায় দূর থেকে অবনীশ এগিয়ে এলো। রুমি দাঁড়িয়ে পড়লো। অবনীশ কাছে এসে বললো, "কী ব্যাপার? জরুরি ডাক মনে হচ্ছে?"

"তুমি সতীশকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছো?" রুমি অবাক কিন্তু শান্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।" অবনীশ একটু দ্বিধা করে বললো।

"কেন?"

"সে-রকম বুঝেছি বলেই ছাড়িয়ে দিয়েছি।" অবনীশ হাসলো, "আশা করি আমার ওপর তোমার সে ভরসা আছে?"

রুমি বললো, "এটা ভরসা অভরসার কথা নয়। আমি জানতে চাইছি, সতীশের অপরাধটা কী ছিল?"

অবনীশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো, "চাকর বাকরের সামান্য বিষয়ে তুমি এত সিরিয়াস হচ্ছো কেন?"

"অবনীশ, এটা আমার কাছে সামান্য ব্যাপার নয়।" রুমি বললো, "আমি যবে থেকে একলা জীবন কাটাতে আরম্ভ করেছি, তবে থেকে সতীশ আমার কাছে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তার কোনো দোষ খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, সে আমাকে নিজের মেয়ের মতো বরাবর আগলে রেখেছে। সে বলতো আমাকে দেখলে সে নিজের মেয়ের কথা ভুলে থাকে। সে কী এমন অপরাধ করতে পারে যে, একদিনের নোটিস না দিয়ে তাকে তুমি বিদায় করে দিলে?"

অবনীশ হেসে রুমিকে বোঝাতে চাইলো, "রমা, তুমি একটা এ্যালসেশিয়ান পুষলেও সে তোমাকে আগলে রাখতো, সেটা কোনো কথা নয়। আমি সতীশের মধ্যে বিশেষ কোনো ত্রুটি—।"

"অবনীশ, মানুষকে এতটা হেয় জ্ঞান করা বোধ হয় ঠিক নয়।" রুমি বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "সতীশের কাজে যদি কোনো বিশেষ ত্রুটি ঘটে থাকে, তাহলে তাকে আমি নিজেই তা জিজ্ঞেস করবো। সতীশের বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে আছে, আমি আজই তাকে চিঠি লিখবো।"

অবনীশের মুখ গম্ভীর হলো, "তার মানে তোমার কাছে আমার থেকে একটা চাকরই বেশি হলো?"

"না, মোটেই তা নয়। তুমি কোথায় আর সতীশ কোথায়, সে-বিচারের ক্ষমতা তোমার ভালোই আছে।" রুমি বললো, "কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। আমি সতীশের কাছে কৃতজ্ঞ। সে যদি কোনো দোষ ত্রুটি করেই থাকে—অবিশ্যি আমি বুঝতে পারছি না, তার মতো লোক কী দোষ করতে পারে, তবু তাকে অন্ততঃ একটা সুযোগ দিতেই হবে। সেইজন্যই তাকে আমি চিঠি লিখে নিয়ে আসবো।"

অবনীশের গম্ভীর মুখ কিছুটা শক্ত হলো, বললো, "এতে কিন্তু আমাকে অপমানই করা হবে। আমি নিজে যাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি, বিশেষ করে একটা চাকর ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তাকে যদি চিঠি লিখে ফিরিয়ে নিয়ে আসো, সে তো এর পরে আমার মাথায় চড়ে বসবে।"

"সতীশের মতো লোক মোটেই মাথায় চড়ে বসার মতো নয়।" রুমি ঈষৎ হেসে বললো, "যে কোনো কারণেই হোক, তুমি সতীশের ওপর রেগে আছো বলেই এ রকম ভাবছো। আর সে রকম কিছু ঘটে থাকলে, সতীশ তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে, তা হলেই তো হলো?" ও ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে চাইলো।

অবনীশ আদৌ সহজ বা সন্তুষ্ট হলো না, বললো, "সতীশের জন্য যদি তোমার সোহাগ এতই উথলে উঠে থাকে, আর তার ঠিকানাও যখন তোমার কাছে আছে, তখন তাকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠালেই হবে।"

"অশালীন কথাবার্তা বলো না অবনীশ।" রুমি এক ধরণের কঠিন হাসি ঠোঁটে বজায় রেখে, শান্ত ভাবে বললো, "সতীশের ওপর সোহাগ উথলে ওঠার কিছু নেই। তা ছাড়া কাজ না করিয়ে, একজনকে মাসে মাসে টাকাই বা আমি দিতে যাবো কেন? ব্যাপারটাকে এত বড় করে আমি দেখতেই চাই না। আসল কথা হলো, সতীশের কাছ থেকে আমি কিছু শুনতে চাই।"

অবনীশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, বললো, "এর থেকে একটা কথাই প্রমাণ হয়, তুমি আমার থেকে সতীশকে বেশি বিশ্বাস করছো। তা নইলে, সতীশকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করার জেদ ধরতে না।"

"এটা জেদের কথা না।" রুমি বললো, "দোহাই অবনীশ, তুমি আমার মনের কথা একটু বোঝবার চেষ্টা করো।"

অবনীশ যেন অধিকতর কঠিন স্বরে বললো, "তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার শেষ কথা, সতীশকে আমি আর এ বাড়িতে দেখতে চাই না।"

"তোমার জেদ দেখে মনে হচ্ছে, সতীশের কাজের দোষ নয়, অন্য কোনো কারণে তুমি তাকে সহ্য করতে পারছো না।" রুমির স্বর কিঞ্চিৎ ধারালো, ঠোঁটে ঈষৎ বক্র হাসি, জিজ্ঞেস করলো, "কারণটা জানতে পারি কী?"

অবনীশ কোনো জবাব না দিয়ে, ফিরে যেতে উদ্যত হয়েও, হঠাৎ সবেগে রুমির দিকে ফিরে যেন চাপা গর্জনের স্বরে বললো, "না, জানতে পারো না। মনে রেখো, তোমাকে কোনো কথারই কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই।" বলেই আবার পিছন ফিরে সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

রুমি দপ্ করে জ্বলে উঠলো, এবং কিছু বলতে গিয়েও, ওর মুখ থেকে কোনো কথা উচ্চারিত হলো না। ওর গলায় ঝুলছিল একটা মুক্তার হার। ও সেটা কঠিন হাতে চেপে ধরলো। ওর জ্বলন্ত মুখে আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। শক্ত হাতে চেপে ধরা মুক্তাহার ছিঁড়ে গিয়ে একটা একটা মুক্তো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো মার্বেল পাথরের মেঝেয়। কিন্তু সেদিকে ওর খেয়াল নেই। রাগে আর যন্ত্রণায় ওর সারা মুখ আকুঞ্চিত হলো। আর মুক্তাগুলো যেন জলের বিন্দুর মতো ঝরে পড়তে লাগলো।

সুধীর, গৌরাঙ্গ আর নমিতা শংকিত বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ বাড়িতে এমন দৃশ্য ওরা আর দেখে নি।

রুমি স্টুডিও থেকে ফিরে কিছুই খায় নি। একটা অসহায়বোধ যেন ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরছিল। সুধীর, গৌরাঙ্গ, নমিতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর সংকোচ হচ্ছিল। গলার মুক্তাহারের অবশিষ্টাংশ ছুড়ে ফেলে দিয়ে, দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। একটা অস্থির যন্ত্রণায় কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। খানিকক্ষণ ছটফট করার পরে, ও দ্বিতীয় ঘরের করিডরের ওপারে, তৃতীয় ঘরটির পর্দা সরিয়ে, ডানদিকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলেছিল। আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল ঘরটি।

রুমি তাকিয়ে দেখেছিল সেই শয্যার দিকে। দেওয়ালের ওপরে টাঙানো ছবির দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিল, লিনেনের

কাপড় দিয়ে গলা অবধি জড়ানো পুতুলটির কাছে। বসেছিল হাঁটু পেতে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছিল পুতুলের গাল, চাদর ঢাকা গায়ে। মুখে ফুটে উঠেছিল একটা আর্তি। পুতুলটিকে টেনে তুলে নিয়েছিল বুকের কাছে, যেন জীবন্ত শিশুকেই মা তুলে নিয়েছিল ব্যাকুল স্নেহে। রুদ্ধ স্বরে বলেছিল, "ওরে বাছা, তুই কি চিরদিন আমার মনের ইচ্ছে হয়েই থাকবি ? আমার এই শরীর, আমার রক্তে মাংসে, তুই কি জীবন্ত হয়ে উঠবি না ?"...তারপরই যেন ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল, "তবে আমি কী করলাম। আমার আশাই যদি না পুরবে, তবে কেন সব দিয়ে-থুয়ে যোগিনী হলাম ?"...পরমুহূর্তেই ও যেন একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠে বলেছিল, "না না, তা হতে পারে না। এত বড়ো ভুল কি আমি করতে পারি ? না না, তা কখনো হতে পারে না। তুই আসবি—আমার নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে। এই ঘর ভরে উঠবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে। উঠবে উঠবে উঠবে।"...ও আস্তে আস্তে আবার পুতুলটিকে শুইয়ে দিয়েছিল। গভীর স্নেহে গায়ে ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই ঘর থেকে।

কিন্তু অন্য ঘরে এসেও ও যেন শান্তি পাচ্ছিল না। বিছানায় বসতে গিয়েও, মাথার কাছে কাজের লোক ডাকার ঘণ্টা টিপেছিল। নমিতা ছুটে এসেছিল। রুমি বলেছিল, "নমিতা, তেজসিংকে একবার গাড়িটা বের করতে বলো। যদি বড়ো গাড়িটা নিয়ে দাদাবাবু বেরিয়ে গিয়ে থাকেন, ছোট গাড়িটা বের করতে বলো। আমি একটু বেরুবো।"

নমিতা নির্দেশ পেয়েই দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল। রুমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস করে বলেছিল, "কী হয়েছে তোমার রুমি সেন ? কী বিষের যন্ত্রণায় তুমি এমন ছটফট করছো ?" কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখের সঙ্গেই চোখাচোখি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে ছিটকে সরে গিয়ে, ওয়ারড্রোবের পাল্লা খুলে, একটি গাঢ় ভায়োলেট

রঙের উত্তরীয় নিয়ে, মাথায় ঘোমটার মতো ঢেকে, গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে গিয়ে দেখেছিল, তেজসিং ছোট গাড়িটা নিয়েই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। রুমিকে দেখেই তাড়াতাড়ি পিছনের দরজা খুলে দিয়েছিল তেজাসং। রুমি উঠে বসেছিল। তেজসিংকে বলেছিল, "আমার বিশেষ কোথাও যাবার নেই। একটু পথে পথে ঘুরবো। যেদিকে হোক চলো।"

তেজসিং-এর পক্ষে মেমসাহেবের কাছ থেকে এ রকম নির্দেশ একেবারে নতুন। সে ময়দানের দিকে গাড়ি ছুটিয়েছিল। রাত্রি তখন আটটাও বাজে নি। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরেছিল আলিপুরের দিকে। হঠাৎ এক জায়গায় ট্রাফিক সিগন্যালের লাল আলো দেখে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রুমির চোখ পড়েছিল রাস্তার ধারে, চওড়া ওয়াকিং স্পেসে। দেখেছিল, ফুটপাতের ওপর গরীবের ডেরা। কাঠ কুটো জ্বেলে, ইঁটের উনোনে কী রান্না হচ্ছিল। একটি স্ত্রীলোক বসে ছিল উনোনের সামনে। একটি শিশু হামা দিয়ে কাছে যেতে যেতে কাঁদছিল। শিশুটি খালি গা, ন্যাংটো। সে একটা হাত মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্ত্রীলোকটির চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল স্নেহের হাসি। হাত বাড়িয়ে বলেছিল, "কী হয়েছে আমার সোনা মাণিক? খিদে পেয়েছে? কোলে আসবি? আয়।" বলে ধুলো মাখা ন্যাংটো শিশুটিকে গভীর মমতায় বুকে টেনে নিয়েছিল। তার অপুষ্ট নত স্তন বের করে, তুলে দিয়েছিল শিশুর মুখে।

রুমি গভীর আবেগ ব্যাকুল চোখে দৃশ্যটি দেখছিল। হঠাৎ নীল সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল তেজসিং। রুমি ওর হাতের ব্যাগটা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছিল, "দাঁড়াও তেজসিং, দাঁড়াও।"

তেজসিং সিগন্যাল পেরিয়ে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রুমি ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে, এক মুহূর্ত যেন কি ভেবেছিল। তারপর বলেছিল, "না থাক। আগে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে চলো।"

গাড়ি ছুটে গিয়েছিল লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে। রুমি গাড়ি থামিয়েছিল একটা রেডিমেড গারমেন্টস শপের সামনে। বেশ কয়েকটা সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের জামা কিনেছিল। পাশে একটা স্ন্যাকস্ বার থেকে কিনেছিল কিছু খাবার। তারপর গাড়িতে উঠে তেজসিংকে বলেছিল, "যেখানে তোমাকে দাঁড়াতে বলেছিলাম, সেখানে আবার ফিরে চলো।"

অবাক তেজসিং নির্দেশ পালন করে, আবার ছুটে গিয়েছিল আলিপুরের সেই তল্লাটে। রুমির নির্দেশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই পথের ধারের ডেরার সামনে। দেখেছিল শিশুটি মায়ের নোংরা আঁচলটা নিয়ে চুষছে, আর মা তখনো রান্না করছে। রুমি দরজা খুলে নেমে পড়েছিল, হাতে জামা আর খাবারের প্যাকেট নিয়ে। তেজসিং তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল।

রুমি এগিয়ে গিয়েছিল শিশুটির দিকে। ওর মা অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছিল। রুমি হেসে প্যাকেটগুলো শিশুটির সামনে রেখে, মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "এর মধ্যে ওর জন্য কয়েকটা জামা আর খাবার আছে, ওকে দিও।"

স্ত্রীলোকটির মুখে কোনো কথা ছিল না। শিশুটি তাকিয়ে ছিল অবোধ কৌতূহলিত চোখে। রুমির চোখেও স্নেহ ফুটে উঠেছিল, আর হাসতে গিয়ে ওর বুকে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে প্রায় ছুটে এসেই গাড়িতে উঠেছিল। তেজসিং গাড়িতে উঠতেই কোনো রকমে উচ্চারণ করেছিল, "বাড়ি।"

বাড়ি ফিরে, গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও, রুমি যেন একটা শান্তি অনুভব করছিল। কারোকে কিছু না বলেই, ও এলিয়ে পড়েছিল বিছানায়। ঘুমোয় নি। যেন একটা স্বপ্নভঙ্গ আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল। রাত্রি যে ঠিক ক'টা বেজেছিল ও মোটেই খেয়াল করে নি।

এই সময়ে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই মত্ত হস্তীর মতো অবনীশ রুমির ঘরে এসে ঢুকলো। এক মুহূর্ত সময়

না দিয়ে, সে রুমির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রুমি তড়িত বেগে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায়, ফুঁসে উঠলো, "অবনীশ, ছাড়ো আমাকে।"

"না, ছাড়বো না।" অবনীশ আহত বাঘের মতো গোঙানো স্বরে, মদের গন্ধ ছড়িয়ে বললো, "কেন ছাড়বো? তোমার যদি একটা চাকরের জন্য জেদ থাকতে পারে, তাহলে আমারও জেদ থাকবে।"

রুমি মরীয়া হয়ে উঠে ছাড়াবার চেষ্টা করে বললো, "না, আমাকে নিয়ে তোমার কোনো জেদ থাকতে পারে না। আমার ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই।"

"আমার অধিকার নেই, তোমার ওপর?" অবনীশ মত্ত ভাবে হেসে উঠলো।

রুমি সেই হাসির ফাঁকেই, অবনীশকে জোরে আঘাত করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আলুথালু বেশে মেঝেয় নেমে দাঁড়ালো। দ্রুত নিঃশ্বাসে ওর বুক ওঠানামা করছে, নাসারন্ধ্র কাঁপছে, চোখ জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ করে। বললো, "না, আমার ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই।"

"আলবৎ আছে।" অবনীশ খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "তোমার সব কিছুর ওপর আমার অধিকার আছে। তোমার বাড়ি গাড়ি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট, এমন কি তোমার প্রতিটি চুক্তিপত্রেও আমার অধিকার আছে।"

রুমি কয়েক পা সরে গিয়ে, ঠোঁট কুঁকড়ে বললো, "হ্যাঁ, সে অধিকার তোমাকে আমিই দিয়েছি।"

"হ্যাঁ তুমিই দিয়েছো, আর সেই জন্যই তোমার সব কিছুর মালিক আমি—আমি অবনীশ চাটুয্যে।" সে এগিয়ে গেল রুমির দিকে।

রুমি দ্রুত পিছিয়ে গেল, তৃতীয় ঘরের করিডরের দিকে, বললো, "হ্যাঁ দিয়েছি, না বুঝে দিয়েছি, বিশ্বাস করে দিয়েছি। আর এই

তুমি একদিন আমার কাকার সমালোচনা করেছিলে। এখন দেখছি, কাকাও তোমার মতো অমানুষ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না।"

"ও সব বড়ো বড়ো কথা রাখো।" অবনীশ হুংকার দিয়ে উঠলো, "তোমার মুখে বড়ো বড়ো কথা, আর চিত্রনটীর সতীত্বের কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। আমি এক কথার মানুষ, আমি যা চাইবো, তোমাকে তাই দিতে হবে। তোমার সব কিছুর ওপর আমার অধিকার আছে।"

রুমি সবেগে মাথা নেড়ে, ঘৃণাস্ফুরিত স্বরে বললো, "না, নেই। তোমাকে আমার বিষয় সম্পত্তি যা কিছু সব দিয়েছি—দিয়েছিলাম একটি আশায়। আজ বুঝেছি, সবই আমার ভুল। কিন্তু আমার ওপর কোনো অধিকারই তোমার নেই। আমার মালিক আমি।"

"ওহ্, একেবারে দেবী ছিন্নমস্তা, অ্যাঁ?" অবনীশ ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে বলে উঠলো, এবং রুমির দিকে এগিয়ে গেল. "ও সব আমি ঢের দেখেছি। তোমার সব কিছুর মতো, তোমার মালিকও আমি।" বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

রুমি তৎক্ষণাৎ ছিটকে ওর তৃতীয় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে বললো, "খবরদার! কাপুরুষ! পশু, একটা মেয়েকে একলা পেয়ে—।"

রুমির কথা শেষ হবার আগেই, এবং দরজা বন্ধ করার আগেই, অবনীশ মত্ত হাতীর মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। চিৎকার করে উঠলো, "একলা মেয়ে! তুমি? রুমি সেন? তুমি তো আসলে একটা—!"

রুমি ছিটকে দূরের দেওয়ালের গায়ে লেপ্‌টে দাঁড়ালো। আলুথালু চুল ও বেশ বাসে, জ্বলন্ত চোখে ওকে এখন দেখাচ্ছে ভয়ংকরী, বললো, "জানোয়ার!"

"জানোয়ার?" অবনীশ ক্ষিপ্ত ভাবে বিছানার কাছে ছুটে গেল, "আর তুমি সতী? ন্যাকামো করে ঘর সাজিয়ে রেখেছো?" বলেই

পুতুলটা এক টানে হাতে তুলে নিল। রুমি চিৎকার করে উঠলো, "অবনীশ!"

অবনীশ মেঝেয় আছাড় মেরে ফেললো পুতুলটিকে। রুমি যেন একটি শিশুর কাতর আর্তনাদ শুনতে পেল, আর ও নিজেও আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো……"আঁ-আঁ-আঁ-আঁ… ।" দু'হাতে নিজের চুল টেনে ধরলো।

"গেট্ আউট আই স্ে!" অবনীশ ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলো, "বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও তোমার ওই রূপ নিয়ে। বেরোও, বেরিয়ে যাও।"

রুমি যেন মুহূর্তেই নিজেকে সামলিয়ে নিল, দ্রুত নিঃশ্বাসে বললো, "হ্যাঁ, তাই যাবো। তাই যাচ্ছি, তবু পাপের হাত থেকে বাঁচবো।" বলেই ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুমি ছুটে বারান্দায় আসতেই নমিতা চিৎকার করে উঠলো, "দিদিমণি গো—"

রুমি যেন অপ্রকৃতিস্থের মতো মাথা নাড়ছে, বারান্দা দিয়ে ছুটছে, আর বিড়বিড় করছে, "না না, আমার কিছু নেই, আমি এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই।"…বলতে বলতে নিজের হাতে দরজা খুলে, বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গেটের দারোয়ান কিছু বোঝবার আগেই রুমি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কোথায় ছুটছে, ও কিছুই জানে না। জীবনের অনেক অভ্যাসই এখন অতীত। পথ চেনা নেই। ও এখন আদৌ প্রকৃতিস্থ নেই। অপমানে, ক্রোধে, আত্ম-অনুশোচনায়, ওর মস্তিষ্ক, ক্রিয়াহীন, কেবল "মা মা" বলে অস্ফুটে ডাকছে। গাল বেয়ে চোখের

জল গড়িয়ে পড়ছে। বড়ো বড়ো জোড়া জোড়া হেডলাইট ধেয়ে আসা গাড়িগুলোকে ও লক্ষ্য করছিল না। ওর দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য ছোটার সঙ্গে গাড়িগুলো তাল রাখতে পারছিল না। কোনো কোনো গাড়ি শব্দ করে ব্রেক কষলো, কোনো গাড়ি ওকে বাঁচাতে গিয়ে ছিটকে পড়লো পেভমেণ্টের ওপর।

কিন্তু দুর্ঘটনা রোধ করা গেল না। রুমি একটা তেলের ট্যাংকবাহী ভারি ট্রাকের গায়ে গিয়ে পড়লো। ট্রাকটা এক মুহূর্ত গতি কমালো। ড্রাইভার জানালা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে তাকালো। রক্তাক্ত একটি নারীমূর্তিকে পড়ে থাকতে দেখেই তার চোখে ফুটে উঠলো ত্রাস। আশেপাশে একবার তাকিয়েই সে দ্রুতগতিতে ট্রাক ছুটিয়ে দিল।

রুমি তখনো একেবারে চৈতন্য হারায় নি। তলপেট, কোমর আর পায়ের কাছে তীব্র যন্ত্রণায় ক্রমেই ওর জ্ঞান লোপ পেয়ে আসছিল। তখনো ওর আশপাশ দিয়ে গাড়ি ছোটাছুটি করছে। লোকজন আশপাশ থেকে হৈ হৈ করে ছুটে এলো। রুমি যেন শুনলো দূরে কারা হৈ চৈ করছে। তার মধ্যে ওর নামটাও শোনা গেল। কয়েকটা গাড়ি একসঙ্গে ব্রেক কষল যেন। ও তখনো মনে মনে ডেকে চলেছে, "মা—মা—মা।" কিন্তু তা উচ্চারিত হচ্ছে না। ও বুঝতে পারছে ওকে একটা গাড়িতে তোলা হলো···গাড়িটা ছুটলো এবং আবার কোথাও নামানো হলো। লিফ্‌টে ওকে তোলা হলো···ওর নাকে এলো ওষুধের গন্ধ।

কে একজন বলে উঠলো, "থানায় তো খবর দেবো। কিন্তু এঁর আপনজন কারোকে তো খবর দেওয়া দরকার। সিরিয়াস ইন্‌জুরি, কিসের থেকে কি হয় বলা যায় না। অন্ততঃ একটা টেলিফোন নাম্বারও যদি পাওয়া যেতো।"

রুমি তীব্র যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু টেলিফোনের কথাটা ওর কানে যেতেই ও কোনো রকমে গোঙানো অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো, "সুধাময়ী দেবী।"······

একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "সুধাময়ী দেবী? দেখ তো, ঐ নামে ডিরেক্টরিতে কোনো টেলিফোন পাওয়া যায় কী না, যদি পাও তা হলে এখুনি ফোন করো। আর একে ইমিডিয়েট্‌লি অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও।"

রুমি কিছু বলবার চেষ্টা করলো, পারলো না। তীব্র যন্ত্রণায় ওর চৈতন্য একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। তারপরে কখন ওর জ্ঞান ফিরে এলো, ও নিজেও জানে না। কেবল মনে হলো ওর শরীরের নিচের অংশ সম্পূর্ণ অসাড়। চোখের ভারি পাতা মেলে একবার তাকালো। সবই ঝাপসা। আবার চোখ বুজলো, আর ওর চেতনা, অচৈতন্যের গভীরে ডুবে গেল।

আবার এক সময়ে, ওর শ্রুতিতে যেন কাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হলো। ওর ঠোঁট নড়লো। শরীরের নিচের অংশ তেমনি অসাড়। ও আস্তে আস্তে একটু চোখ মেলে নিস্তেজ ক্ষীণ স্বরে বললো, "আমি কোথায়?"

"তুই এখন নার্সিং হোমে।" সুধাময়ীর স্বর।

সুধাময়ীর স্বর শুনেই, রুমি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো, ফুঁপিয়ে ডেকে উঠলো, "মা, তুমি এসেছো?"

"না এসে কোথায় যাবো।" সুধাময়ী রুদ্ধস্বরে বললেন, "সর্বনাশী, তুই যে সর্বনাশ করে বসে আছিস।"

"না না না, এখন এত ইমোশনাল কথাবার্তা মোটেই বলা উচিত না।" একটি গম্ভীর ব্যস্ত পুরুষের স্বর এগিয়ে এলো, "এতে আবার রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা। এমনিতেই অনেক রক্ত দেওয়া হয়েছে।"

রুমি চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ডাক্তারের এ্যাপ্রন পরা, চশমা চোখে মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই ডাক্তার। সুধাময়ী রুমির বুকের কাছে হাত রেখে বললেন, "চুপ কর, শান্ত হ। চোখ বুজে থাক। কথা বলবার অনেক সময় পাবি। ডাক্তার বলেছেন, এ যাত্রা বেঁচে যাবি।"

রুমির বন্ধ চোখের কোণে জলের বিন্দু টলটলিয়ে উঠলো, ফিসফিস করে বললো, "কেন বেঁচে গেলাম? কেন—কেন?"...

সুধাময়ীর চোখেও জল। তিনি রুমির ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিয়ে বললেন, "চুপ কর, চুপ কর।..আমি এখন যাচ্ছি, ওবেলা আবার আসবো।" বলে গালে কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন।

রুমি চোখ বুজে রইলো, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

রুমি জেগে আছে। জানালা দিয়ে বিকালের আলো এসে পড়েছে ওর বিছানায়। নার্স ওর টেম্পারেচার নিল ঠোঁটের ভিতরে থার্মোমিটার গুঁজে দিয়ে। চার্টে লিখলো। একটা ট্যাবলেট জল দিয়ে খাইয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল মুখ। সুধাময়ী ঘরে ঢুকলেন।

রুমি দেখেই ডেকে উঠলো, "মা।"

"এই যে মা।" সুধাময়ী এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটি খবরের কাগজ। বিছানার পাশে একটি আসনে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কেমন আছিস?"

রুমি বললো, "এমনিতে ভালোই। কিন্তু মা, কোমরের কাছ থেকে সব যেন অসাড়। মনে হয় আমার যেন পা দুটো নেই।"

সুধাময়ী মুখটা ফিরিয়ে নিলেন, এবং কান্না রোধ করলেন। রুমি ডাকলো, "কী হলো মা, এদিকে ফেরো।"

সুধাময়ী ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করলেন, একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "কিছু না। খবরের কাগজে তোর এ্যাকসিডেন্টের খবর বেরিয়েছে, শোন, পড়ে শোনাই।"

"কী হবে মা ও সব শুনে?" রুমির রুগ্ন চোখে মুখে হতাশা ফুটে উঠলো।

সুধাময়ী বললেন, "তোর শোনা দরকার। দেশের মানুষ তোকে কতোখানি ভালোবাসে, সেটাও জানা দরকার।"

"ভালোবাসা—ভালোবাসা।" রুমি অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, চোখ উঠলো ছলছলিয়ে।

সুধাময়ী কাগজ খুলে পড়তে লাগলেন, "চিত্রতারকা রুমি সেন রহস্যময় দুর্ঘটনায় পতিত।···বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, রুমি সেন ১২ অক্টোবর রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময়, চলন্ত গাড়ির তলায় চাপা পড়েন। তাঁর সঙ্গে কোনো গাড়ি বা সঙ্গী ছিল না। যে গাড়িটি তাঁকে চাপা দেয়, তার কোনো হদিস আজও করা যায় নি। রুমি সেন রাত্রি সাড়ে দশটায় একাকিনী রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ায়, স্বভাবতঃই সকলের মনে বিশেষ রহস্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। খবরটি আমাদের অফিসে এসে পৌঁছোবার আগেই, লোক মুখে ঝড়ের বেগে খবর ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন আমাদের অফিসে টেলিফোন করে তাঁর খবর জানতে চাইছেন। তিনি যে নার্সিং হোমে চিকিৎসিত হচ্ছেন, সেখানে যোগাযোগ করে আমরা জানতে পেরেছি, তাঁর আঘাত বেশ গুরুতর, তবে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সংবাদের পরেই, তাঁর অভিনয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ চিত্রগুলি পরিবেশকরা প্রদর্শনীর জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। জনসাধারণও ছবিগুলি দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"···

শুধু শেষের লাইনটি পড়লেন না, "ডাক্তারের অভিমত, সম্ভবতঃ রুমি সেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর কোনদিনই রূপোলী পর্দায় আবির্ভূত হতে পারবেন না।"···

রুমি শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো। ওর চোখের সামনে, ওরই ছবি দেওয়া বড়ো বড়ো হোর্ডিং আর পোস্টারগুলো ভেসে উঠতে লাগলো।

সুধাময়ী কাগজটা ভাঁজ করে বললেন, "শুনলি তো?"

"এ্যা !" রুমি যেন চমকে উঠলো, তারপর আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে একটি উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো, "শুনলাম।"

সুধাময়ী একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "কিন্তু এবার আমাকে বলতো, কেন অমন করে তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলি। কী করে এমন সর্বনাশ তুই ঘটালি ?"

রুমি বললো, "মা, তুমি তো আমাকে জানো। নিরুপায় না হলে, আমি কখনো এমন ধরনের কাজ করি না। তোমার মনে আছে, এক সময়ে কাকার বাড়ি ছেড়ে আমি চলে এসেছিলাম।"

"একটা ফোনও তো আমাকে করতে পারতিস—" সুধাময়ী বললেন।

রুমি বললো, "না মা, তখন সে পরিস্থিতি ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই করতাম।"

সুধাময়ী একটু নীরব থেকে বললেন, "কিছুই যে খবর পাই নি, তা নয়, তোকে তো বলেই ছিলাম, তোর উকীলও বলেছিলেন, আগে থেকে ওভাবে সবকিছু অবনীশের নামে—।"

"মা, ও সব কথা থাক।" রুমি বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "ও কথা আর আমি শুনতে চাই না, বলতেও চাই না। মা, তোমার একটা হাত দাও।"

সুধাময়ী একটি হাত রুমির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। রুমি হাতটি ধরে বললো, "মা, সেই কত কাল আগে, একটা কবিতা আবৃত্তি করে, এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে একটি সোনার মেডেল পেয়েছিলাম। আজ আমার বড়ো ইচ্ছে করছে, সেই মেডেলটা বুকে পরি।"

"কোথায় আছে সেই মেডেল ?" সুধাময়ী ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

রুমি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "জানি না। কাকা নিয়ে নিয়েছিলেন, আর দেন নি। সেই মেডেল আর পাবো না। কিন্তু মা, আজ সেই কবিতাটি তোমাকে শোনাবো।"

"থাক না, এই শরীরে আবৃত্তি করবি?" সুধাময়ী ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন।

রুমি আবেগ ব্যাকুল স্বরে বললো, "কিছু হবে না মা, একটু শোনো, রবিঠাকুরের কবিতা, ছোট একটি কবিতা।"

সুধাময়ী অদূরে দাঁড়ানো ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার মাথা কাত করে, হাত তুলে সম্মতি দিলেন। রুমি তত্‌ক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছে:

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।"

বলতে বলতে ওর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। সুধাময়ীর চোখও ভিজে উঠেছে। রুমি তবু বলে গেল:

"বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।"......

"চুপ কর রুমি।" সুধাময়ী রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন।

রুমি তথাপি বলে গেল:

"যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা...... ।"

রুমির গলার স্বরও অতলে ডুবে গেল। রুদ্ধ কান্নার বেগে বুক দুলে উঠলো। সুধাময়ীর হাতটি নিজের ঠোঁটের ওপর রেখে, ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো, "মা, আমার জীবনে সেই সোনার মেডেলই সব থেকে বড় পুরস্কার। আজ আর আমাকে সেই মেডেল কে দেবে, কে দেবে? সেই কবিতাই যে আমার জীবনে অমর হয়ে রইলো।"

ডাক্তারের মুখে আবেগ, তাঁর চোখও যেন ভেজা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে কেবিন থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রুমিকে নার্সিং হোম থেকে সুধাময়ী তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। একই জীবনে রুমি সেনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আজ ও কেবল সর্বস্বহারা না, ওর একটি পা হাঁটু থেকে এ্যাম্পুটেট করতে হয়েছে। পাঁজরার ছুটি হাড় ফ্র্যাকচার হয়েছে। বাঁদিকের গালে চিরদিনের জন্য একটি তীক্ষ্ণ ছুরির মতো ক্ষতের রেখা পড়েছে।

সুধাময়ীর স্বামী ছেলে মেয়েরা সকলেই রুমিকে সাদরে গ্রহণ করলো। তথাপি রুমি একান্তে সুধাময়ীকে বললো, "কেন এই বোঝা তুমি বয়ে নিয়ে এলে মা। আমাকে কোনো আতুর আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।"

"ছি রুমি, আমাকে তুই এ কথা বলতে পারলি?" সুধাময়ী কম্পিত আবেগে বললেন, "তুই না আমার মেয়ে? মেয়ের শারীরিক ক্ষতি হলে, মা কি মেয়েকে আতুর আশ্রমে পাঠায়? আর কখনো যেন এ কথা না শুনি।"

রুমি ঠোঁটে ঠোঁট টিপলো, তবু চোখের কোণ শুকনো রাখা গেল না, ছলছল করে উঠলো। ক্রাচ বগলে, সুধাময়ীর সঙ্গে ওর নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাথরুম সংলগ্ন একটি দক্ষিণের বড়ো জানালা খোলা ঘরে ওর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। নীচু সিঙ্গল বেড খাটে নরম বিছানা। একপাশে একটি টেবিল, ছুটি চেয়ার। রুমি এক নজরেই দেখে নিল, টেবিলের একপাশে কাশ্মীরী কাঠের বুক-কেসে কেসে সাজানো রয়েছে কবিতার বই। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী—সকলের বই সেখানে থরে থরে সাজানো। মোরাদাবাদী পেতলের ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। অন্য পাশে ড্রেসিং টেবিল।

সুধাময়ীর স্বামী, বাঘা ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার মহিম দত্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথায় ধূসর চুল, বিচক্ষণ চোখ মুখ, অথচ স্নেহ কোমল। রুমিকে সস্নেহে আহ্বান করলেন. "এসো মা। এ বাড়িকে তোমার নিজে বাড়ি বলে জানবে।"

রুমি ভুলে গেল তার বগলে ক্রাচ রয়েছে। ও হাত বাড়িয়ে নত হয়ে মহিমবাবুকে প্রণাম করতে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি রুমির হাত ধরে ফেললেন, "আহা করো কী মা, পড়ে যাবে যে! আমি এমনিই তোমার নমস্কার নিচ্ছি। আগে তুমি খাটের ওপর উঠে বসো, তারপরে কথা হবে।"

কথা? কথা কি আর কিছুই অবশিষ্ট আছে রুমির জীবনে? ও উদ্গত নিঃশ্বাস চাপলো।

সুধাময়ীর দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে সকলের ছোট। বয়স ষোল সতেরো। ওর নাম তপন—তপু বলেই ডাকা হয়। তপুর ওপরের বোন নীলা, লোরেটোতে পড়ে। তপু পড়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে। বড় মেয়ে শীলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, একটি রুচিশীল সুখী পরিবার। তপু নীলা রুমিকে এমন ভাবে হেসে জড়িয়ে ধরলো, যেন সত্যি ও ওদের আপন দিদি।

রুমি ক্রাচ বগলে দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিকে একটি বাগান রয়েছে। সবুজ একটি টেনিস লন। সুধাময়ী স্বামী ও পুত্র কন্যাকে ইশারা করে, সবাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুমি অনেকক্ষণ বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলো, আসলে ও বাগানের কিছুই দেখছিল না। ওর অন্যমনস্ক চোখে নিজের বাড়ির বিরাট বাগান আর লন ভেসে উঠছিল। তারপরে সহসাই ও যেন বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়লো। খাটের কাছে গিয়ে, ক্রাচ দুটো রাখতে উদ্যত হতে চোখ পড়ে গেল আয়নার দিকে। নিজের দিকে একবার দেখেই তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে, ক্রাচ দুটো খাটের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো।

রুমির দিনগুলো কাটতে লাগলো, কখনো কবিতা পড়ে, কখনো ক্রাচ বগলে বাগানে ঘুরে, কখনো তপু নীলার সঙ্গে গল্প করে। সুধাময়ী শুটিং করতে যান, বাড়ি ফিরে আসেন। ইচ্ছা করেই তিনি স্টুডিও বা চিত্রজগতের কথা ওর কাছে বলেন না। রুমি নিজেই শুনতে চায় না। রুমির সেই পরিচিত জগত। স্টুডিওর ফ্লোর, ক্যামেরা, লাইট, কলাকুশলীদের ব্যস্ত চেনা মুখগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক একদিন সেখানকার কথা জিজ্ঞেস করার জন্য ওর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু ও নিজেকে দমন করে। যে জগৎ ওকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আজ সেই জগৎ থেকে ও নির্বাসিতা। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই ওর পুরনো ছবিগুলো নতুন করে রিলিজের বিজ্ঞাপন দেখতে পায়। কিন্তু ওর খোঁজ খবর কেউ করে না। এখন আর কেউ ওর কাছে ছুটে আসে না, স্তাবকের ভিড় নেই ওর চারপাশে। ও অনুভব করে, আস্তে আস্তে রুমি সেন হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্তরালে।

এরই নাম জীবন, একদা উজ্জ্বল তারকার জীবন। চোখের বাহির তো মনেরও বাহির। বেঁচে আছে কিছু অতীতের ছবিতে। কিন্তু সমালোচকরা সকলেই মূঢ় অকৃতজ্ঞ অবিবেচক না। কেউ কেউ এখনো, নবাগতা বা রুমির সমসাময়িক নায়িকাদের সঙ্গে ওর তুলনা দেয়। ওকে বড়ো করে তোলে। হাসি পায় না, বুকটা মুচড়ে ওঠে, তাই কাগজটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখে রুমি।

রুমি আরো বুঝতে পারে, সুধাময়ীব সঙ্গে স্টুডিওতে ওকে নিয়ে কিছু কিছু কথাবার্তা হয়। হয়তো সেই সব কথাবার্তা ওকে করুণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিত্রজগত সম্পর্কে ওর নির্বাক জিজ্ঞাসা-হীন শীতল স্তব্ধতা সুধাময়ী বুঝতে পারেন। তিনিও অতএব যেচে কিছু বলতে পারেন না।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ঋতু অতিক্রম করে যায়। রুমি বাগানের দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পারে। তার মধ্যেই একদিন সুধাময়ী ওকে পায়েস করে খাওয়ালেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজালেন। রুমি প্রথমটা বুঝতে পারে নি। বোঝার পরে সুধাময়ীর বুকে পড়ে কেঁদে বলেছে, "না না, আর কেন মা তুমি সেই দিনগুলোকে মনে করিয়ে দাও?"

সুধাময়ী করুণ হেসে বলেছেন, "আমি যে মা। পুরনো দিনকে মনে করিয়ে দেবো কেন? এ তো আমার সাধ।"

বৎসারন্ত হয়ে গিয়েছে। সুধাময়ী স্টুডিওতে গিয়েছেন। মহিমবাবু কোর্টে। তপু, নীলা বাড়িতে ছিল না, রুমি জানে না। ও বাড়িতে একলা খাটে শুয়ে ছিল। অপরাহ্নের ম্লান আলো এসে পড়েছে ওর ঘরে। হঠাৎ ওর মনে পড়লো, আজ খবরের কাগজটা ওকে দেওয়া হয় নি। ও বেল টিপতেই তপু এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলো, "রুমিদি, কাকে ডাকছো?"

রুমি বললো, "ওহ্, তপু তুমি? তপু আজ কি খবরের কাগজ দেয় নি?"

"হ্যাঁ দিয়েছে তো।" তপু অবাক হয়ে বললো, "তুমি ছাখো নি?"

রুমি বললো, "না, সকাল থেকে খবরের কাগজ পাই নি।"

"আমি এনে দিচ্ছি।" বলেই তপু ছুটলো, আর এক মিনিটের মধ্যেই খবরের কাগজ এনে রুমির হাতে তুলে দিল।

রুমি হেসে বললো, "থ্যাংক্যু তপু!"

"নো মেনসান !" তপু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুমি খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো। এ পাতা ও পাতা দেখতে দেখতে সিনেমার পাতায় একটা বড় মাপের বিজ্ঞাপনে ওর চোখ আটকে গেল। বিজ্ঞাপনটা এই রকম, "নতুন বছরের উপহার। আজ সন্ধ্যায় শুভমুক্তি। অবনীশ চ্যাটার্জি প্রযোজিত ও পরিবেশিত, 'নক্ষত্রলোক ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজ' এর 'স্বর্ণমারীচ।' বিশেষ আকর্ষণ, নবাগতা তৃণা রায়—চিত্রাকাশে প্রতিশ্রুতিময়ী উজ্জ্বল তারকা।"—বিজ্ঞাপনে লাস্যময়ী একটি তরুণীর ছবি, সম্ভবত তৃণা রায়েরই ছবি।

বিজ্ঞাপনটা দেখতে দেখতে রুমির হাত কাঁপছিল। কাগজটাও কাঁপছিল। ওর চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠলো, "অবনীশ চ্যাটার্জি প্রযোজিত পবিবেশিত—।" লেখাটা বড়ো হতে হতে যেন গোটা ঘরটা ছেয়ে গেল, আর রুমির দুই চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলে উঠলো, কেঁপে কেঁপে উঠলো নাসারন্ধ্র, ও অস্ফুটে বলে উঠলো, "না না, আমি ওকে ছাড়বো না, ওকে আমি কিছুতেই এত সহজে ছেড়ে দেবো না।"

রুমি ঝটিতি উঠে বসলো। কাগজটা রেখে দিল পাশে। ভুলে গেল, ও ক্রাচ ছাড়া চলতে পারে না। পা বাড়িয়ে খাট থেকে নামতে গিয়েই, মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কিন্তু পরোয়া করলো না। খাট চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে, ক্রাচ দুটো বগলে চেপে ঘরের বাইরে গেল। ওর চুল আঁচড়ানো নেই, বিছানায় শোয়া দোমড়ানো মোচড়ানো ওর পোশাক। কোনো দিকে ওর লক্ষ্য নেই। সকলের অলক্ষ্যে ও ক্রাচ বগলে বাইরে চলে গেল।

এ্যাকসিডেণ্টের পরে এই প্রথম রুমি ঘরের বাইরে এলো। না, কেউ ওকে চিনতে পারছে না। ও ক্রাচ ঠুকে ঠুকে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। ওর ঠোঁট নড়ছে, আর ফিসফিস করে বলছে, "না, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না, দেবো না……।"